অনুমান
রাবণের
প্রতিভা

আরজ আলী মাতুব্বর

নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ
শ্রদ্ধার্ঘ্য

(মিথ্যার সন্ধানে অনুমান)

আরজ আলী মাতুব্বর

রচনাকাল: ১৩.৪.১৩৮৮ – ৮.৩.১৩৮৯
প্রকাশকাল (প্রথম সংস্করণ): কার্তিক, ১৩৯০

অনুমান

আরজ আলী মাতুব্বর

ধর্মকারী সংস্করণ: মার্চ, ২০১৭

ধর্মকারী ইবুক

ধর্মকারী
dhormockery

প্রকাশক
ধর্মকারী
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ
আরজ আলী মাতুব্বর-এর
মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে 'কবি'

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

Anumaan, by Aroj Ali Matubbor
Pdf eBook Edition: March, 2017
Published by: Dhormockery eBook
Dhaka, Bangladesh.
Created by: NoroSundor Manush

সূচিপত্র

{ইবুকটি ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক ও বুকমার্ক যুক্ত, **পর্ব টাইটেল বা বুকমার্কে** মাউস ক্লিক/টাচ করে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠা ও সূচিপত্রে আসা-যাওয়া করা যাবে}
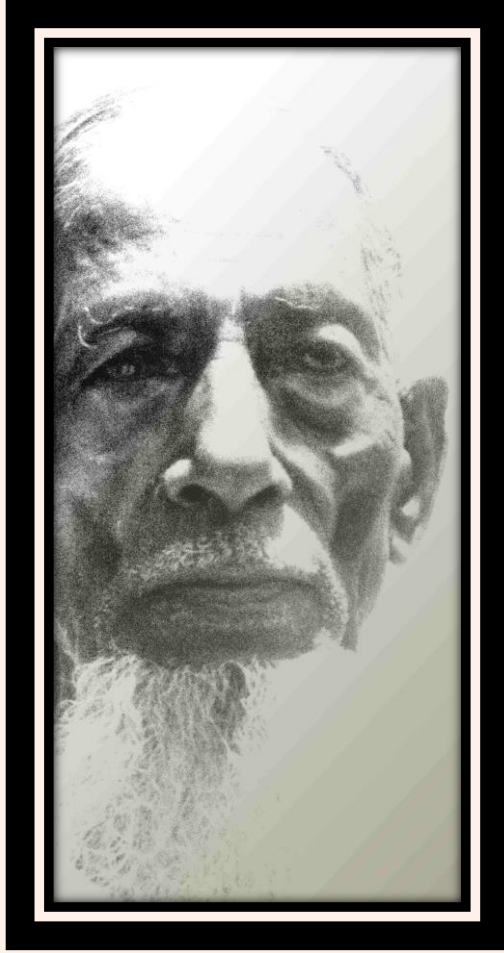
আরজ আলী মাতুব্বর

(১৭ ডিসেম্বর, ১৯০০ – ১৫ মার্চ, ১৯৮৫)

আপনার দেখানো পথেই আমাদের অবগাহন

'ধর্মকারী', 'নরসুন্দর মানুষ' ও 'কবি'র সম্মিলিত শ্রদ্ধার্ঘ্য

ভূমিকা

অনুমান করে কথা বললে লোকে তা বিশ্বাস করতে চায় না, চায় যুক্তি ও প্রমাণ। কিন্তু বলবার সাথে সাথে সকল কথা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কেননা হাট-বাজার ও পথে-ঘাটে লোকে তো কতো কথাই বলে থাকে, সংগে তো কারো কোন প্রমাণপত্র থাকে না। তবে বক্তব্যের যুক্তিটা থাকা দরকার সর্বত্রই। কোনো তত্ত্বমূলক বিষয়ে তো নয়ই, যুক্তিহীন (আন্দাজী) কথা বাজারেও চলে না। তাই আমি যুক্তির সাহায্যে কতিপয় বিষয়ের সত্যের সন্ধান করতে চেয়েছিলাম এবং সে জন্য লিখেছিলাম সত্যের সন্ধান নামীয় একখানা পুস্তিকা ১৩৫৮ (১৯৫১) সালে। আর তার অপর একটি নামও দিয়েছিলাম 'যুক্তিবাদ'। পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই যুক্তিবাদ-এর কঠিন দেয়াল ডিঙিয়ে আমাকে নেয়া হয়েছিলো পবিত্র হাজতখানায়। তাই এবারে সত্যের সন্ধান না করে মিথ্যার সন্ধান করতে চেষ্টা করছি এবং 'যুক্তিবাদ'-এর আশ্রয় না নিয়ে আমি আশ্রয় নিচ্ছি ‘অনুমান’-এর। তাই এ পুস্তিকাখানার নামকরণ করা হলো – মিথ্যার সন্ধানে অনুমান। এতে যুক্তিবাদের কঠিন দেয়াল নেই, আছে স্বচ্ছ কাচের আবরণ।

মূলত অনুমান তুচ্ছ বিষয় নয়। এর আশ্রয় না নিয়ে মানুষের এক মুহূর্তও চলে না। অনুমান করবার শক্তি ক্ষীণ বলেই ইতর প্রাণী মানুষের চেয়ে এত পিছনে এবং মানুষ এত অগ্রগামী তার অনুমান করবার শক্তি প্রবল বলেই। ভবিষ্যতের চিন্তা মাত্রেই অনুমান, কতক অতীতেরও। আর ভবিষ্যৎ ও অতীত বিষয়ের চিন্তা ও অনুমান করতে পারে বলেই মানুষ মানুষ হতে পেরেছে।

অনুমান-এর বাস্তব ও অবাস্তব দুটি রূপ আছে। তবে ভবিষ্যৎ যাবত বর্তমান-এ পরিণত না হয়, তাবৎ সে 'রূপ ধরা পড়ে না। আবার এমন অনুমানও আছে, যার বাস্তব রূপ কোনো কালেই ধরা পড়তে চায় না।

পরমেশ্বর বলে কেউ আছেন কি-না, এ প্রশ্নটির মীমাংসা অনুমানসাপেক্ষ। প্রশ্নটি অতীতেও ছিলো, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও হয়তো থাকবে; সুমীমাংসা হয়নি আজও, হয়তো হবেও না কোনোদিন। মীমাংসা হলে – আস্তিক ও নাস্তিক, এ দুটো সম্প্রদায় থাকতো না বা থাকবে না। কিন্তু সে আশা দুরাশা মাত্র।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু খবর আজ আমরা পাচ্ছি — ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব ইত্যাদির মাধ্যমে। আবার কতক খবর জানা যায় কেচ্ছা-কাহিনী ও পৌরাণিক পুথি-পত্তরের মাধ্যমে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই কাহিনীকাররা ঘটনার বাস্তব রূপটি পরিবেশন করেননি। পৌরাণিক কতোগুলো কাহিনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বহু গোষ্ঠীগত স্বার্থের কারণেই। সে সমস্ত কাহিনীর বাস্তবরূপ অনুধাবন করার একমাত্র উপায় অনুমান। আর তারই সামান্য চেষ্টা করা হয়েছে এ পুস্তিকাখানার মাধ্যমে।

এ পুস্তিকাখানায় উল্লিখিত প্রসঙ্গসমূহে আরোপিত আমার অনুমানগুলো যে অন্য কারো অনুমানের সাথে মিলবে, এমন আশা আমি করি না। তবে প্রিয় পাঠকবৃন্দের কাছে আমার অনুরোধ যে, তারা যেনো আমার আলোচ্য বিষয়সমূহ নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন এবং ওগুলোর যাথাথ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।

এ পুস্তিকাখানা প্রণয়নে আমাকে উৎসাহিত ও সহযোগিতা দান করেছে শিক্ষামোদী তরুণ যুবক প্রিয় মো. ফিরোজ সিকদার। আমি তার উন্নত জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

রচনাকালীন আমার এ লেখাগুলোর প্রতিটি শব্দ ধন্য হয়েছে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেবের শুভদৃষ্টির পরশে। কিন্তু সেজন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি না। কেননা আমার লেখার কলমটাই তার।

এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানার মুদ্রণকালে যথারীতি প্রুফ সংশোধনের অভাবে এতে ভুলের পরিমাণ এতই বেশী রয়ে গেলো যে, শুদ্ধিপত্রেও তা শুদ্ধ হবার নয় এবং তা একান্তই লজ্জাকর। প্রিয় পাঠকবৃন্দের বিরক্তিজনক সে সব ভুলের জন্য তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই।

বিনীত

গ্রন্থাকার

আরজ আলী মাতুব্বর

৭ কার্তিক, ১৩৯০

রাবণের প্রতিভা

রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক রামচন্দ্র রাজপুত্ত্বর, ধর্মপরায়ণ, বীর, ধীর, সুসভ্য, সুকান্ত, জ্ঞানী, গুণী ইত্যাদি শত শত গুণাত্মক বিশেষণে ভূষিত। পক্ষান্তরে রাবণ – বিকলাঙ্গ (দশমুণ্ড), স্বৈরাচারী, অসভ্য, রাক্ষস, কামুক ইত্যাদি শত শত দোষাত্মক বিশেষণে দুষ্ট। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? হয়তো আর্য-ঋষি বাল্মীকি — আর্যপ্রীতি ও অনার্যবিদ্বেষ বশত শ্রীরামকে প্রদীপ্ত ও রাবণকে হীনপ্রভ করার মানসে একের প্রোজ্জ্বল ও অন্যের মসিময় চিত্র অংকিত করেছেন নিপুণ হস্তে রামায়ণের পাতায়। কিন্তু তার তুলির আঁচড়ের ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ পাচ্ছে রাবণের কৌলিন্য, শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আসল কান্তির ছিটেফেঁটা; যার ঔজ্জ্বল্য রামচরিত্রের উজ্জ্বলতার চেয়ে বহুগুণ বেশী।

রামচন্দ্র ছিলেন ক্ষত্রকুলোদ্ভব, চার বর্ণের দ্বিতীয় বর্ণের মানুষ। সেকালের ক্ষত্রিয়রা ছিলো বংশগত যোদ্ধা, অর্থাৎ নরঘাতক। আর রাবণ ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশীয়। এ কথাটা শুনে রামভক্ত হিন্দু ভাইয়েরা হয়তো আঁতকে উঠতে পারেন। ব্রাহ্মণ-এর সাধারণ সংজ্ঞা হলো – ব্রহ্মাংশে জন্ম যার, অথবা বেদ জানে যে, কিংবা বেদ অধ্যয়ন করে যে, নতুবা ব্রহ্মের উপাসনা করে যে — সে-ই ব্রাহ্মণ। ঋষিগণ সর্বত্রই উক্ত গুণের অধিকারী। তাই ঋষি মাত্রেই ব্রাহ্মণ। রাবণের দাদা পুলস্ত্য ছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং স্বনামধন্য ঋষি। কাজেই তিনি ছিলেন বংশে ও গুণে উভয়ত ব্রাহ্মণ। পুলস্ত্য ঋষির পুত্র অর্থাৎ রাবণের পিতা বিশ্রবাও ছিলেন একজন বিশিষ্ট ঋষি। কাজেই তিনিও ছিলেন বংশগত ও গুণগত ব্রাহ্মণ। তাই ব্রাহ্মণ ঋষি বিশ্ববার পুত্র রাবণ গুণগত না হলেও কুলগত ব্রাহ্মণ ছিলেন নিশ্চয়ই। এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত আলোচনাসমূহে রাম ও রাবণের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার তুলনামূলক কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে।

১. রাবণের রাজমহলকে (কখনো লঙ্কাকেও) বলা হয়েছে 'স্বর্ণপুরী। এতে রাবণের ঐশ্বর্য, শিল্প-নিপুণতা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, রুচিবোধ ইত্যাদি বহু গুণের পরিচয় মেলে। কিন্তু রামচন্দ্রের বাড়িতে এমন কিছুর উল্লেখ দেখা যায় না, যার দ্বারা তার ওসব গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

২. লঙ্কায় সীতাদেবী রক্ষিতা হয়েছিলেন রাবণের তৈরী অশোক কাননে। তা ছিলো রাবণের প্রমোদ উদ্যান, যেমন আধুনিক কালের ইডেন গার্ডেন। সে বাগানটিতে প্রবেশ করলে কারো শোকতাপ থাকতো না। তাই তার নাম ছিলো অশোক কানন। সে বাগানটির দ্বারা রাবণের সুরুচি ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকন্তু তিনি যে একজন উদ্ভিদবিদ্যা বিশারদ ছিলেন তা-ও জানা যায়। আর তার প্রমাণ মেলে একালের সুপ্রসিদ্ধ খনার বচনে।

খনা বলেছেন:

"ডেকে কয় রাবণ, কলা-কচু না লাগাও শ্রাবণ।"

শত শত জাতের ফল-ফুল ও লতাগুলেমর বৃক্ষরাজির একস্থানে সমাবেশ ঘটিয়ে তা লালনপালন ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু জানা যায় না রামচন্দ্রের বাড়িতে কোনো ফুল-ফলের গাছ আদৌ ছিলো কি না।

৩. রামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়েছিলেন কপিকুলের (বানরের) সাহায্যে মাটি-পাথর কেটে বাঁধ নির্মাণ করে, দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায়। কিন্তু **লঙ্কা থেকে ভারতের দণ্ডকারণ্য তথা পঞ্চবটী বনে রাবণ যাতায়াত করেছিলেন 'পুষ্পক' নামক বিমানে আরোহণ করে অতি অল্প সময়ে। রাবণ যে একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বা বৈমানিক এবং কারিগরিবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন, তা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ক্ষেত্রে রাবণের সহিত শ্রীরামের তুলনাই হয় না।**

৪. রামচন্দ্র যুদ্ধ করেছেন সেই মান্ধাতার আমলের তীর-ধনু নিয়ে। আর রাবণ আবিষ্কার করেছিলেন এক অভিনব যুদ্ধাস্ত্র, যার নাম 'শক্তিশেল। তা শক্তিতে ছিলো যেনো

বন্দুকের যুগের ডিনামাইট। নিঃসন্দেহে এতে রাবণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় মেলে।

৫. রামচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে রাবণের মুমূর্ষু সময়ে তার কাছে গিয়ে রামচন্দ্র রাজনীতি সম্বন্ধে তার উপদেশপ্রার্থ হয়েছিলেন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তিনি রামচন্দ্রের সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলেন ধীর ও শান্তভাবে, সরল মনে। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাবণ সে যুগের একজন রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন। অধিকন্তু ছিলেন ধৈর্য, সহন ও ক্ষমাশীল এবং প্রতিহিংসাবিমুখ এক মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

৬. রামায়ণ মহাকাব্যে রাবণকে বলা হয়েছে দশানন। কিন্তু বাস্তবে রাবণের দশটি মুণ্ড নিশ্চয়ই ছিলো না। তবে **তার মাথার মজ্জা অর্থাৎ জ্ঞান ছিলো দশটা মুণ্ডের সমান। তা-ই রূপকে বিদূপে অংকিত হয়েছে রাবণ দশমুণ্ডু রূপে।**

৭. রাক্ষস বা নরখাদক বলা হয়েছে রাবণকে। উপরোক্ত আলোচনাসমূহের পরে এ বীভৎস বিশেষণটি সম্বন্ধে আর কিছু সমালোচনা আবশ্যক আছে বলে মনে হয় না। তবুও প্রিয় পাঠকবৃন্দের কাছে একটি প্রশ্ন না রেখে পারছি না। রাবণের দাদা হচ্ছেন পুলস্ত্য, পিতা বিশ্রবা, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবের এবং পুত্র ইন্দ্রজিৎ (প্রসিদ্ধ বৈমানিক) ; এরা সকলেই ছিলেন সভ্য, ভব্য, সুশিক্ষিত, গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি। এঁরা কেউই রাক্ষস বা কাচামাংসভোজী মানুষ ছিলেন না। রাবণও তার শৈশবকালাবধি মাতা-পিতার রান্না করা খাবারই খেয়েছেন নিশ্চয়। অতঃপর যৌবনে হঠাৎ করে একদিন তিনি খেতে শুরু করলেন জীবের কাচামাংস । বিমান বিহার, শক্তিশেল নির্মাণ ও অশোক কানন তৈরী করতে জানলেও তিনি রান্নার পাকপাত্র গড়তে বা রান্না করতে জানেন নি। বেশ ভাল। কিন্তু তিনি কোথায় বসে, কোন দিন, কাকে খেয়েছেন – তার একটিরও নামোল্লেখ নাই কেন?

৮. রাবণের সন্তানাদি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে –

"একলক্ষ পুত্র আর সোয়ালক্ষ নাতি,
একজন না থাকিল বংশে দিতে বাতি।"

আর অপর একটি প্রবাদ আছে –

"যাহা কিছু রটে
তার কিছু বটে।"

প্রবাদবাক্যের লক্ষ পুত্র না হোক তার শতাংশ সত্য হলেও রাবণের পুত্রসংখ্যা হয় এক হাজার এবং তার অর্ধাংশ সত্য হলেও সে সংখ্যাটি হয় পাঁচশ'। আর তা-তো বিস্ময়ের কিছু নয়। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রও ছিলেন একশ এক পুত্রের জনক। আর রাম? তার পুত্রের সংখ্যা কথিত হয় মাত্র দুটি বলা চলে একটি। কেননা তারা ছিল সীতার এক গর্ভজাত, যমজ সন্তান। তদুপরি সে পুত্রযুগল জন্মেছিলো নাকি রামচন্দ্রের বিবাহের তেপ্পান্ন বছর পর (বাস্তব ১২ + ১৪ = ২৬ বছর পর)। বছরের এ হিসেবটা প্রিয় পাঠকদের কাছে একটু বেমানান বোধ হতে পারে। তাই বছরগুলোর একটা হিসাব দিচ্ছি। বিবাহন্তে রামচন্দ্র গৃহবাসী ছিলেন ১২ বছর, বনবাসী ১৪ বছর এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করে রাজাসনে কাটান নাকি ২৭ বছর (ঐ ২৭ বছর উদ্দেশ্যমূলক, কালপনিক)। এর পর কলঙ্কিনী বলে প্রাথমিক অন্তঃসত্ত্বা সীতাদেবীকে নির্বাসিত করা হয় বাল্মীকির তপোবনে, সেখানে জমে সীতার যুগল সন্তান কুশ ও লব।

সীতাদেবী বন্ধ্যা ছিলেন না এবং উক্ত তেপ্পান্ন বছরের মধ্যে বনবাসকালের দশ মাস (অশোক কাননে রাবণের হাতে সীতা বদিনী ছিলেন ১০ মাস) ছাড়া বায়ান্ন বছর দুমাস সীতা ছিলেন রামচন্দ্রের অঙ্কশায়িনী। তথাপি এ দীর্ঘকাল রতিবিরতি রামচন্দ্রের বীর্যহীনতারই পরিচয়, নয় কি?

৯. রামচন্দ্রের কাহিনীকারের মতে **চোদ্দ বছর বনবাসান্তে রামচন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্তন করে নির্বিঘ্নে সংসারধর্ম তথা রাজ্যশাসন করেছিলেন দীর্ঘ ২৭ বছর। অতঃপর প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো।** কেননা লঙ্কার অশোক কাননে বন্দিনী থাকাকালে রাবণ

সীতাদেবীর সতীত্ব নষ্ট করেছিলেন এবং অসতী সীতাকে গৃহে স্থান দেওয়ায় প্রজাগণ ছিলো অসন্তুষ্ট।

উপরোক্ত বিবরণটি শুনে স্বতই মনে প্রশ্নের উদয় হয় যে, মরার দুযুগের পরে কান্না কেন? বনবাসান্তে রামচন্দ্র স্ববাসে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর বনবাসের বিবরণ তথা লঙ্কাকাণ্ড দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিলো তার দেশে ফেরার সংগে সংগেই এবং সীতাকলঙ্কের কানাকানিও চলছিলো দেশময় তখন থেকেই। আর গুজবের ভিত্তিতে সীতাদেবীকে নির্বাসিত করতে হলে তা করা তখনই ছিলো সঙ্গত। দীর্ঘ ২৭ বছর পর কেন?

রামচন্দ্র সীতাদেবীকে গৃহত্যাগী করেছিলেন শুধু জনগণের মনোরঞ্জনের জন্য, স্বয়ং তাঁকে নাকি 'নিকলঙ্কা' বলেই জানতেন। এইরূপ পরের কথায় নিষ্কলঙ্কা স্ত্রী ত্যাগ করার নজির জগতে আছে কি? এই তো সেদিন (১৯৩৬) গ্রেট বৃটেনের সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড মিসেস সিম্পসনকে সহধর্মিনী করতে চাইলে তাতে বাধ সাধলো দেশের জনগণ তথা পার্লামেন্ট মিসেস সিম্পসন হীনবংশজাত বলে। পার্লামেন্ট এডোয়ার্ডকে জানালো যে, হয় মিসেস সিম্পসনকে ত্যাগ করতে হবে, নচেৎ তাঁকে ত্যাগ করতে হবে সিংহাসন। এতে এডোয়ার্ড সিংহাসন ত্যাগ করলেন, কিন্তু তাঁর প্রেয়সীকে ত্যাগ করলেন না। শুধু তা-ই নয়, তাঁর মেঝ ভাই ডিউক-অব-ইয়র্ককে সিংহাসন দিয়ে তিনি সস্ত্রীক রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন বিদেশে। রামচন্দ্রেরও তো মেঝ ভাই ছিলো!

সীতাদেবীর সতীত্ব রক্ষার জন্য রামায়ণের কাহিনীকার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। যেখানে তিনি লৌকিক অবলম্বন খুঁজে পাননি, সেখানে অলৌকিকের আশ্রয় নিয়েছেন। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি —

ক. রাবণের অশোক বনে সীতার সতীত্ব রক্ষার কোনো অবলম্বন তিনি খুঁজে পাননি। তাই সেখানে বলেছেন যে, জোরপূর্বক কোনো রমণীর সতীত্ব নষ্ট করলে রাবণের মৃত্যু

হবে, এই বলে কোনো ঋষি তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কাজেই মৃত্যুভয়ে রাবণ সীতাকে স্পর্শ করেননি। সুতরাং সেখানে সীতার সতীত্ব বেঁচে আছে।

খ. সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় পৌছুলে সেখানে যখন সীতাকলঙ্কের ঝড় বইছিলো, তখন বলেছেন যে, সীতাদেবীকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলে তাঁর সতীত্বের পরীক্ষা করা হয়েছিলো, তাতে তাঁর কেশাগ্রও দগ্ধ হয়নি। সুতরাং সীতার সতীত্ব বেঁচে আছে।

গ. বহুবছর বাল্মীকির তপোবনে কাটিয়ে শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞে কুশ-লবসহ বাল্মীকির সাথে সীতাদেবী রামপুরীতে উপস্থিত হলে পুনঃ যখন তিনি লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে থাকেন, তখন কবি বলেছেন যে, সীতাদেবীর অনুরোধে ধরণী দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিলো এবং সীতাদেবী সে গর্তমধ্যে প্রবেশ করে স্বর্গে বা পাতালে গিয়েছেন ইত্যাদি।

উপরোক্ত ঘটনাগুলো হয়তো এরূপও ঘটে থাকতে পারে। যথা –

ক. রাবণের রূপলাবণ্য ও শৌর্যবীর্য দর্শনে প্রীতা হয়ে সীতাদেবী রাবণকে স্বেচ্ছায় করেছেন দেহদান এবং তাঁকে রাবণ করেছেন বীর্যদান। সীতাদেবীর প্রতি রাবণ বলপ্রয়োগ করেন নি, তাই তিনি মরেননি। হয়তো **এমনও হতে পারে যে, রাবণ যেদিন সীতার প্রতি বলপ্রয়োগ করেছেন, সেদিন তিনি রামের হাতে মরেছেন। আর সেইদিন সীতাদেবী হয়েছেন অন্তঃসত্ত্বা।**

খ. সীতাদেবীকে নিয়ে রামচন্দ্র অযোধ্যায় পৌছুলে লঙ্কাকাণ্ড প্রকাশ হওয়ায় সেখানে তখন সীতাকলঙ্কের ঝড় বইছিলো নিশ্চয়ই। হয়তো সীতার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য প্রথমত জেরাজবানবন্দি, কটুক্তি, ধমকানি-শাসনি ও পরে মারপিট ইত্যাদি শারীরিক নির্যাতন চালানো হচ্ছিলো তাঁর প্রতি। কিন্তু তিনি নীরবে সহ্য করেছিলেন সেসব নির্যাতন, ফাস করেননি কভু আসল কথা। আর সেটাই হচ্ছে সীতার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

গ. শ্রীরামের রাজপ্রাসাদে সীতা প্রসঙ্গে অতঃপর থমথমে ভাব বিরাজ করছিলো কিছুদিন (২৭-২৮ দিন বা এক রজোমাস যাকে বলা হয় ২৭ বছর)। পরে সীতাদেবীর মাসিক নির্বাসিত করেছিলেন বাল্মীকির তপোবনে এবং সেখানে জন্মেছিলো তাঁর যুগল সন্তান কুশ-লব।

সন্তান কামনা করে না, এমন কোনো লোক বা জীব জগতে নেই। কারো সন্তান না থাকলে তার দুঃখের অবধি থাকে না; বিশেষত ধনিক পরিবারে। আর রাজ্যেশ্বর রামচন্দ্রের বৈবাহিক জীবনের দীর্ঘ ২৬ বছর পরে আসন্ন সন্তান পরিত্যাগ করলেন শুধু কি প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য? নিশ্চয়ই তা নয়। তিনি জানতেন যে, সীতার গর্ভস্থ সন্তান তার ঔরসজাত নয়, ঔরসজাত রাবণের। আর সঙ্গত কারণেই সীতার গর্ভজাত সন্তানের প্রতি তার কোনো মায়ামমতা ছিলো না, বরং ছিলো ঘৃণা ও অবজ্ঞা। তাই তিনি সীতা-সুতের কোনো খোজখবর নেননি বহু বছর যাবত। বিশেষত ঋষি বাল্মীকির আশ্রম অযোধ্যা থেকে বেশি দূরেও ছিলো না, সে আশ্রম তিনি চিনতেন।

অতঃপর সীতাসহ কুশ-লব বিনা নিমন্ত্রণে (বাল্মীকির নিমন্ত্রণ ছিলো) ঋষি বাল্মীকির সাথে শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে যেদিন রামায়ণ কীর্তন করে, সেদিন কুশ-লবের মনোরম কান্তি ও স্বরে-সুরে মুগ্ধ হয়ে রামচন্দ্র তাদের দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। হয়তো তখন তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, ঘটনাক্রমে ফেলনা হলেও ছেলে দুটো (কুশ-লব) রাজপুত্র তো বটে।

কুশ-লবকে গ্রহণ করলেও সীতাকে গ্রহণ করেননি রামচন্দ্র সেদিনও। সীতাদেবী হয়তো আশা করেছিলেন যে, বহু বছরান্তে পুত্ররত্ন-সহ রাজপুরীতে এসে এবার তিনি সমাদর পাবেন। কিন্তু তা তিনি পান নি, বিকল্পে পেয়েছিলেন যতো অনাদর-অবজ্ঞা। তাই তিনি ক্ষোভে-দুঃখে হয়তো আত্মহত্যা করেছিলেন। **নারীহত্যার অপবাদ লুকানোর উদ্দেশ্যে এবং ঘটনাটি বাইরে প্রকাশ পাবার ভয়ে শ্মশানে দাহ করা হয়নি সীতার শবদেহটি,**

হয়তো লুকিয়ে গ্রোথিত করা হয়েছিল মাটির গর্তে, পুরীর মধ্যেই। আর তা-ই প্রচারিত হয়েছে 'স্বেচ্ছায় সীতাদেবীর ভূগর্ভে প্রবেশ বলে।

সে যা হোক, অযোধ্যেশ্বর রাম ও লঙ্কেশ্বর রাবণের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে পযালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, রাবণ ছিলেন শত শত সন্তানের জনক, আর রামের ছিলো না একটিও পুত্র। তিনি ছিলেন বন্ধ (আঁটকুড়া)। লঙ্কেশ্বর রাবণের যাবতীয় গুণগরিমা ও সৌরভ-গৌরব গুপ্ত রাখার হীন প্রচেষ্টার মুখ্য কারণ — তিনি আধ্যাত্মবাদী ছিলেন না, ছিলেন জড়বাদী বিজ্ঞানী। বিশেষত তিনি আর্যদলের লোক ছিলেন না, ছিলেন অনার্যদলের লোক। এরূপ অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত নয়।

আর একটি কথা। শুধুমাত্র রাম ও রাবণকে নিয়ে রামায়ণ হতে পারে না, হনুমানকে বাদ দিয়ে। তাই এখন হনুমান প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করছি। ঋষি বাল্মীকি ছিলেন প্রচণ্ড রামভক্ত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে কথিত হয়েছে যে, বাল্মীকি যৌবনে রত্নাকর নামে একজন দস্যু ছিলেন। পরে নারদের উপদেশে দসুবৃত্তি ত্যাগ করে ছয় হাজার বছর একস্থানে উপবিষ্ট থেকে রামনাম জপ করেন। সেই সময় তার সর্বশরীর বলমীকে সমাচ্ছন্ন হয়। পরে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে বলমীক হতে উত্থিত হওয়ায় তিনি বাল্মীকি নামে খ্যাত হন।

যিনি আহার-নিদ্রা ও চলাফেরা পরিত্যাগ করে ছয় হাজার বছর বা ছয় বছরও রামনাম জপ করতে পারেন, রামের শৌর্য, বীর্য, গুণ-গরিমা ও ইজ্জৎ বৃদ্ধির জন্য তিনি কি না করতে পারেন? শীরামের প্রাধান্য রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি গুণী, জ্ঞানী ও সুসভ্য রাবণকে রাক্ষস বানিয়েছিলেন, ভাগ্যিস পশু বানান নি। রামায়ণ মহাকাব্যের বনপর্বে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে হনুমান, জাম্ববান, সুগ্রীব ও তার ভ্রাতা বালীরাজ। রামায়ণের কাহিনীকার তাদের সদলে অঙ্কিত করেছেন পশুরূপে। বিশেষত হনুমান, সুগ্রীব ও বালীরাজকে সদলে বানর বানিয়েছেন এবং জাম্ববানকে বানিয়েছেন ভালুক। কিন্তু তারা কি আসলেই পশু ছিলো?

সে যুগে স্বর্গগত দেবতাদের কেউ কেউ মর্ত্যবাসী কোনো কোনো মানবীর সাথে যৌনাচারে লিপ্ত হতেন এবং তৎফলে কোনো সন্তানের জন্ম হলে সে দেবতা হতো না বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষও হতো না, হতো অসাধারণ মানুষ। যেমন – সূর্যদেবের ঔরসে কুমারী কুন্তির গর্ভে জন্ম নেন কর্ণ। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত যোদ্ধা ও দাতা। দেবতা যমের ঔরসে পাণ্ডুপত্নী কুন্তির গর্ভে জন্মলাভ করেন যুধিষ্ঠির। তিনি ছিলেন ধার্মিক চূড়ামণি, যার ফলে তাঁর নাম হয়েছিল ধর্মরাজ। ইন্দ্রদেবের ঔরসে কুন্তির ক্ষেত্রে জন্ম নেন অর্জুন। তিনি ছিলেন সে যুগের ভারতবিখ্যাত যোদ্ধা ইত্যাদি। কিন্তু কোনো দেবতা কখনো কোনো পশুর সাথে যৌনাচারে লিপ্ত হচ্ছেন এবং তাতে কোনো পশুরূপী সন্তান জন্ম নিচ্ছে, এমন কাহিনী কোথাও কোনো পুরাণশাস্ত্রে দেখা যায় না। পৌরাণিক মতে এখানে হনুমানের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিচ্ছি। এতে দেখা যাবে যে, **হনুমানরা সবাই ছিলো মানুষ। এবং ওদের আভিজাত্যও রামের চেয়ে বহুগুণ বেশি।**

প্রথমত হনুমান — পবনদেবের ঔরসে মানবী অঞ্জনার গর্ভে এর জন্ম। কাজেই হনুমান দেব-মানবের বংশজাত একজন বীর্যবন্ত মানব।

দ্বিতীয়ত জাম্ববান – এ হচ্ছে দেবতা ব্রহ্মার পুত্র। জাম্ববানের কন্যার নাম জাম্ববতী এবং তাকে বিয়ে করেন হিন্দুদের পরম পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং জাম্ববান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর। কাজেই সে ভালুক বা পশু হতে পারে না, সে ব্রহ্ম বংশের মানুষ; সুতরাং ব্রাহ্মণ।

তৃতীয়ত বালী ও সুগ্রীব – দেবরাজ ইন্দ্রের (মতান্তরে সূর্যের) ঔরসে ও ব্রহ্মার মানসকন্যা রক্ষরজার গর্ভে বালী ও সুগ্রীবের জন্ম হয়। সুতরাং বালী ও সুগ্রীব হচ্ছে ইন্দ্রের বা সূর্যের পুত্র এবং ব্রহ্মার দৌহিত্র (নাতি)। বিশেষত ব্রহ্মার বংশজাত বলে তারা ব্রাহ্মণত্বের দাবীদার।

উপরোক্ত আলোচনাসমূহের দ্বারা অনুমান হয় যে, **রামায়ণোক্ত বানররা পশু ছিলো না, তারা ছিলো ভারতের 'কিষ্কিন্ধ্যা' নামক অঞ্চলের আদিম অধিবাসী এবং আলোচ্য ব্যক্তিরা ছিলো সেকালের বিশিষ্ট ব্যক্তি।** কেননা রামায়ণ মহাকাব্যে অজস্র বানরের আভাস থাকলেও প্রাধান্য পেয়েছে এরাই।

এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী মর্গানের মতবাদ অনুধাবনযোগ্য। মর্গানের মতে – বেচে থাকার তাগিদেই মানুষকে জোট বাধতে হয়েছে। জোট মানে দল। কিন্তু কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে দল বাধবে? মর্গানের গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে যে, সে সময় মানুষ দল বেঁধেছিলো জ্ঞাতি সম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের জ্ঞাতি, একই পূর্বপুরুষ থেকে তাদের জন্ম। মর্গান এমনি এক একটি দলের নাম দিয়েছিলেন গেনস্ (Gens)। মর্গানের পরের যুগের নৃবিদরা গেনস্ শব্দের বদলে ক্লান (Clan) শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং ক্লান শব্দটিই চলছে।

কয়েকটি ক্লান একসঙ্গে জোট বাধলে যে বড়ো দলটি গড়ে ওঠে, তার নাম দেয়া হয়েছে ট্রাইব (Tribe)। আবার অনেকগুলো ট্রাইব মিলে আরো বড়ো একটি সংগঠন, তার নাম কনফেডারেসি অব ট্রাইবস।

সাধারণত জন্তু-জানোয়ারের নাম থেকেই ক্লানের নাম হতো। যেমন – ভালুক, নেকড়ে বাঘ, হরিণ, কাছিম ইত্যাদি। আবার ফুল, ফল, লতাপাতার নাম থেকেও ক্লানের নামকরণ হতো। এধরণের নামকরণের মূলে যে বিশ্বাসটি রয়েছে, তাকে বলা হয় টোটেম বিশ্বাস।

পাক-ভারত উপমহাদেশের সাওতাল উপজাতির শতাধিক গোত্র বা টোটেম আছে, হো উপজাতির আছে ৫০টিরও বেশী। এরূপ মুণ্ডা উপজাতির প্রায় ৬৪টি, ভীল উপজাতির ২৪টি, ছোটা‌ে নাগপুরের খারিয়া উপজাতির ৮টি এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার দৌড়ি উপজাতির মধ্যে ৪টি গোত্র বা টোটেম রয়েছে। এদের প্রত্যেক গোত্রই — পশু,

পাখী, গাছপালা অথবা কোনো বস্তুর নামে পরিচিত। আমাদের দেশেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐরূপ বহু গোত্রের নাম দৃষ্ট হয়, যদিও এগুলোকে ঠিক টাোটেম বলা যায় না। যেমন – সেন (শ্যেন = বাজপাখী), নাগ (সপ), সিংহ (পশুরাজ) ইত্যাদি। গোত্রের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে তার গোত্রের টোটেমের নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। যেমন – সিংহ গোত্রের সবাই সিংহ, বাঘ গোত্রের সবাই বাঘ, হরিণ গোত্রের সবাই হরিণ ইত্যাদি।

মর্গানের মতে বিশেষত আধুনিক বহু নৃতত্ত্ববিদের মতে – রামায়ণোক্ত জাম্ববান ও হনুমানাদি ভালুক ও বানররা পশু ছিলো না, তারা ছিলো সেকালের কিষ্কিন্ধ্যার (ভারতের দণ্ডকারণ্যের অংশবিশেষ, আধুনিক নাম নাশিক) অনার্য অধিবাসী (মানুষ)। বানরাদি ছিলো তাদের টোটেম বা বংশগত উপাধি মাত্র। অধিকন্তু এ-ও অনুমান হয় যে, হয়তো হনুমান ও সুগ্রীব ছিলো কোনো ক্লান ও ট্রাইব-এর অধিকর্তা এবং বালী ছিলো কোনো 'কনফেডারেসী অব ট্রাইবস-এর অধিপতি, অর্থাৎ রাজা।

পরিশেষে – রামভক্ত ভাইদের সবিনয়ে বলছি যে, মানুষ ও পশু-পাখীর চেহারা, চরিত্র ও ভাষা – এ তিনে প্রকাশ পেয়ে থাকে তাদের স্বকীয়তা বা ব্যক্তিত্ব। কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে মানুষের সমকক্ষ অপর কোনো জীব নেই। কেননা মানুষের মতো অন্য কোনো জীবের – দন্ত, ওষ্ঠ, তালু, জিহ্বা ইত্যাদি স্বরযন্ত্র নেই। তাই রামায়ণে কবি কিষ্কিন্ধ্যবাসীদের চেহারা বদলিয়ে বানরাদি বানিয়েছেন বটে, কিন্তু তাদের ভাষা ও চরিত্র বদলাতে পারেননি, তা রেখেছেন সর্বত্রই মানুষের মতো। রামায়ণ গ্রন্থই তার সাক্ষী।

ফেরাউনের কীর্তি

পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে উল্লিখিত মোশি (হজরত মুসা আ.) ও ফরৌণ (ফেরাউন) সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাচ্ছে। ফরৌণ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে হলে প্রথমেই জেনে নেওয়া আবশ্যক — ফরৌণ কি বা কে। কারো কারো মতে ফরৌণ কোনো এক ব্যক্তির নাম। আসলে তা নয়। ফরৌণ মিশররাজদের উপাধিমাত্র। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে, প্রথমত মোশি ও পরে ফরৌণ সম্বন্ধে।

মোশির সর্বোচ্চ গৌরব ও সম্মানজনক উপাধি হলো 'কালীমুল্লাহ অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত কথোপকথনকারী। মোশি মিশর দেশ থেকে সবংশে কেনান দেশে যাবার পথে সীনয় পর্বতের (তুর পর্বতের) পাদদেশে যখন ছাউনী ফেলছিলেন, তখন নাকি জাভে (ইহুদীদের ঈশ্বর) তাঁর সাথে বাক্যালাপ করার উদ্দেশ্যে উক্ত পর্বতের উপরে নেমেছিলেন এবং তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন নানান প্রসঙ্গে। মোশি সেখানে সদলে অবস্থান করেছিলেন ১১ মাস ১৯ দিন। **(যাত্রাপুস্তক ১৯ ; ১ ও গণনাপুস্তক ১০; ১১)** অর্থাৎ প্রায় এক বছর। এ সময় ঈশ্বর একনাগাড়ে ওখানেই ছিলেন, না অন্যত্র যাওয়া-আসা করছিলেন, তা জানি না। তবে মোশির সাথে নাকি তাঁর কথাবার্তা চলছিল প্রতিদিন।

পবিত্র বাইবেল পাঠে বোঝা যায় যে, 'জাভে' নামক ঈশ্বরটির ইউরোপ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি মহাদেশ ও চীন, জাপান, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদির অধিবাসীদের জন্য যেনো কোন মাথাব্যথা নেই, তিনি যেনো ইহুদী জাতি তথা বনি-ইস্রায়েলদের সমাজ ও ঘর-সংসার নিয়েই ব্যস্ত। তিনি যেনো শুধু ইহুদী জাতির ঈশ্বর, অন্য কারো নয়। নিরাকার ও সর্বব্যাপী ঈশ্বর নির্দিষ্ট একটি স্থানে দাড়িয়ে থাকতে ও মানুষের মতো

কথাবার্তা বলতে পারেন — এ শুনে চিন্তাবিদ দার্শনিকগণ তো বটেই, কোনো বিবেকবান ব্যক্তিও হাসি সামলাতে পারেন না।

মোশির আর একটি বিভূতি হলো — ইহুদী ধর্মের প্রাণকেন্দ্র তৌরিত 'কেতাব' ও 'দশ আদেশ প্রাপ্তি। ঈশ্বর নাকি তুরপর্বতে বসে দশটি উপদেশবাণী দুখানা পাথরে লিখে মোশি প্রদান করেছিলেন বনিইস্রায়েল সমাজে প্রচার করার জন্য। **আদেশ দশটি এই–**

১. আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য খোদা না থাকুক।

২. তুমি খোদিত প্রতিমা বানাইও না।

৩. তুমি অনর্থক ঈশ্বরের নাম লইও না।

৪. বিশ্রামদিন পালন করিও।

৫. মাতাপিতাকে সমাদর করিও।

৬. নরহত্যা করিও না।

৭. ব্যভিচার করিও না।

৮. চুরি করিও না।

৯. প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।

১০. তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না।

উক্ত আদেশগুলোর মর্মবাণী যাই হোক, ‘পরমেশ্বরের নিজ হাতের লেখা বলেই ওগুলোর অতিশয় কদর ইহুদী ধর্মরাজ্যে। **পরমেশ্বরের হাত আছে এবং লেখার জন্য তিনি মানুষের মতোই কালি, কলম, পাত্র ইত্যাদি ব্যবহার করেন – মনে হয় যে, আধুনিক কালের একান্ত ধর্মভীরু কোনো ব্যক্তিও এ কথা মেনে নিতে পারেন না।** কেননা ওরূপ প্রস্তরে লিখিত বা খোদিত শিলালিপি বর্তমানে অসংখ্য পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। মোশির প্রাপ্ত দশ আদেশ সম্বলিত পাথর দুখানা অতীতের কোনো শিলালিপি হওয়াই স্বাভাবিক, নয় কি?

লক্ষাধিক নবী-আম্বিয়ার মধ্যে মোশি সর্বপ্রধান নবী নন এবং তুর পর্বতও চিরপবিত্র স্থান নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন হজরত মোহাম্মদ (দ:) এবং চিরপবিত্র স্থান হলো মক্কা শহর, হেরা পর্বত, বিশেষত কাবা ঘর। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সাথে আলাপ আলোচনার জন্য মক্কা শহরে, হেরা পর্বতে বা চিরপবিত্র কাবা ঘরে জাভে পদার্পণ করলেন না একদিনও, কথা বললেন দূতের মারফতে। পক্ষান্তরে সাক্ষাত আলোচনার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকেই একদিন যেতে হলো 'জাভোএর নিকটে, মেরাজে। অথচ একজন সাধারণ পয়গম্বরের সাথে বাক্যালাপের জন্য 'জাভেই এলেন বনবাদাড় ও শৈলাকীর্ণ তুর পর্বতের শিখরে। এ বিষয়টি সংগতিহীন, নয় কি?

'ফরৌণ' বলতে যারা কোনো একব্যক্তিকে বোঝেন, তাঁদের মতে, **ফরৌণের সর্বোচ্চ কুখ্যাতি হলো যে, তিনি নিজেকে নাকি ঈশ্বর বলে দাবী করেছিলেন এবং তিনি নাকি বেঁচেও ছিলেন হাজার বছর।** এরূপ দাবী যদি কোনো ফরৌণ করেও থাকেন, তবে তিনি কোন ফরৌণ, সত্যিই এরূপ দাবী করেছেন কি-না, তা ভালোভাবে জেনে নেওয়া আবশ্যক। কেননা ফরৌণ তো আর দু-চারজন ছিলেন না।

ঐতিহাসিকদের মতে, খৃ: পূ: ৩২০০ অব্দে সম্রাট মেনেস মিশরে ১ম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং খ. পূ. ৩৩২ অব্দে সম্রাট আলেকজাণ্ডার মিশর অধিকার করার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ বছর মিশরে ৩১টি রাজবংশ রাজত্ব করে। এর মধ্যে বহু ব্যক্তি মিশরের রাজ-তত্বে আরোহণ করেন এবং যখনই যিনি আরোহণ করেন, তখন তিনিই 'ফরৌণ আখ্যায় আখ্যায়িত্ব হন। বলা বাহুল্য যে, এতোধিক ফরৌণগণ যে সবাই একই চরিত্রের মানুষ ছিলেন, নিশ্চয়ই তা নয় এবং তাঁরা যে সবাই একই গুণে গুণী বা একই দোষে দোষী ছিলেন তাও নয়।

মিশরে এক জনদরদী ফরৌণ ছিলেন ১ম আহমিস (খৃ: পূ: ১৬১০ অব্দে মৃত্যু)। সেকালে মিশরে দাসপ্রথা ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক। মিশরের অধিকাংশ ফরৌণরাই সাধারণ প্রজা ও দাসদের প্রতি অন্যায়, অত্যাচার ও নানাবিধ জুলুম করে তাদের জীবন বিষময় করে

তুলতো। কিন্তু ফরৌণ ১ম আহমিস ছিলেন তার বিপরীত। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা। দুঃস্থ জনগণের সুখ-শান্তি ও মঙ্গল বিধানই ছিলো তাঁর জীবনের ব্রত। **তাই মিশরীয়রা তাঁকে দেবতা ঈশ্বর) জ্ঞানে ভক্তি-অর্ঘ্য দান করতো। এমনকি মৃত্যুর পর তাঁর মূর্তিমিশরবাসীগণ পরবর্তী প্রায় হাজার বছর কাল (অর্থাৎ খ, পু ৫২৫ অব্দে পারস্য রাজশক্তি মিশর অধিকার করার পূর্ব পর্যন্ত) ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করতো। কোনো ফরৌণই হাজার বছর জীবিত ছিলেন না, ফরৌণ আহমিসও না। তবে তাঁর উপাধি ও মূর্তিপূজা অক্ষুন্ন ছিলো প্রায় হাজার বছর। বোধহয় যে, তা থেকেইজন্ম নিয়েছে ফরৌণের খোদায়ী দাবীর ও হাজার বছর বাঁচার প্রবাদবাক্যটি।**

মৃত্যুর পরেও যদি কোনো ব্যক্তির নাম, মূর্তি, ছবি, ব্যবহারিক বস্তু, সমাধি ইত্যাদি জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করে, তবে তা কি তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় নয়? রাশিয়ানরা মহামতি লেনিনের শবদেহ সমাধিস্থ করেননি, পরম যত্নে রক্ষা করেছেন 'দর্শনীয়'রূপে। রোজ সেখানে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয় এবং সবাই তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানায়। এটা তাঁর অপরাধ নয়, মহত্ত্ব।

মিশরবাসীগণ আহমিসকে দেবত্ব দিয়েছে এবং শ্রদ্ধাভরে তাঁর পূজা করেছে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই। আহমিস নিজে কখনো দেবত্ব দাবী করেননি এবং বলপূর্বক তার পূজোও চাপিয়ে দেননি কারো মাথার উপর। আর বলপূর্বক চাপিয়ে দিয়ে থাকলে তা তাঁর মৃত্যুর পরেই বন্ধ হয়ে যেতো, প্রচলিত থাকতো না হাজার বছর কোনক্রমেই। তবে কথায় না হলেও ইঙ্গিতে কিছুটা দাবী করেছিলেন অপর একজন। তিনি হলেন ফরৌণ চতুর্থ আমেন হোটেপ (খৃ: পূ: ১৪২৮–১৩৮৮)।

সেকালের মিশরীয়দের মনে আল্লাহ, খোদা, নিরাকার ব্রহ্ম, পরম ঈশ্বর ইত্যাদির মতো একেশ্বর-কল্পনা ছিলো না, ছিলো বহু দেব-দেবী বা বহু ঈশ্বরের কল্পনা ও প্রচলিত ছিলো বহুবিধ পূজা। পুরোহিতরা ছিলেন ঈশ্বরদের প্রতিনিধি। জনসাধারণের বিশ্বাস ছিলো যে, পুরোহিতরা যা বলেন, দেবতারা তা-ই শোনেন, মানেন ও করেন। এরূপ

বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সুচতুর পুরোহিতরা নিবোধ জনগণের পক্ষ হয়ে তাদের সার্বিক মঙ্গল সাধন ও অমঙ্গল থেকে রক্ষার জন্য দেবতাদের কাছে (যজমানকে শুনিয়ে শুনিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে) আবেদন-নিবেদন করতেন এবং তার বিনিময়ে প্রচুর অর্থ আদায় করতেন (এরূপ কৌশলে অর্থ আদায়ের প্রথা এ যুগেও আছে)। পুরোহিতরা তাবিজ-কবচ বিক্রি করেও অর্থ আদায় করতেন দেদার। সবচেয়ে বেশী মূল্য ছিলো পরকালের তাবিজ-এর পুরোহিতরা এমন একটি তাবিজ লিখে দিতেন, যা মৃতের সঙ্গে (গলায় বা অন্য কোন স্থানে বেঁধে) দিলে কবরে বা পরলোকে মৃত ব্যক্তির কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয় না। সহজেই অনুমেয় যে, এরূপ একটি তাবিজ (ঈশ্বরের কাছে চিঠি)-এর মূল্য কতো বেশী। সারাজীবন অসৎকাজ করেও কায়ক্লেশে এরূপ একটি তাবিজ খরিদ করতে পারলেই ব্যস। এভাবে নানা উপায়ে অর্থ উপার্জন করে মিশরীয় পুরোহিতরা এমনই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন যে, তাঁরা শুরু করেন সম্রাটের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে, তার কাজে হস্তক্ষেপ করতে।

দেশের জনগণের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মীয় অধঃপতন এবং পুরোহিতকুলের ঔদ্ধত্য দর্শনে অতিষ্ঠ হয়ে ফরৌণ আমেন হোটেপ সংস্কারমূলক এক নতুন ফরমান জারি করেন। তাতে তিনি বহু দেবদেবীর পূজা বন্ধ করে দেন এবং একমাত্র সূর্যদেবতা এটন-এর পূজার প্রচলন করেন, সারা দেশে নির্মাণ করেন এটনের নামে মন্দির। তিনি সমস্ত মন্দির থেকে অন্যান্য সব দেবদেবী এবং প্রস্তরফলক থেকে তাদের নাম নষ্ট করে ফেলেন। তিনি সব পুরোহিতকে মদির থেকে তাড়িয়ে দেন, নিজেকে এটন-এর প্রতিনিধি বলে দাবী করেন এবং স্বয়ং আমেন হোটেপ' নাম পরিবর্তন করে 'ইখনাটন অর্থাৎ এটনের প্রিয়জন — এই নাম ধারণ করেন। বোধ হয় যে, এখান থেকেও ফরৌণের ঈশ্বরত্বের দাবী বা খোদায়ী দাবী, এ প্রবাদবাক্যটির উৎপত্তি হতে পারে।

ফরৌণ ইখনাটন এটনকে ঈশ্বর বলেছেন, এবং নিজেকে তাঁর 'প্রিয়জন বলে দাবী করেছেন। আর এরূপ দাবী তো প্রায় সকল ধর্মবেত্তাই করেছেন। তাঁরা নিজেকে কেউ

বলেছেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি, কেউ বলেছেন প্রিয়জন, কেউ বলেছেন বন্ধু (দোস্ত) এবং কেউ তো পুত্রত্বেরও দাবী করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ-ই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের দাবী করেননি, ইখনাটনও তা করেননি।

ইখনাটন মিশরে একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন, এটনকে (সূর্যকে) ঈশ্বর) বলেছেন, দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করেছেন এবং ঈশ্বরের নামে মন্দির ড়েছেন। এ প্রসংগে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর জীবনাখ্যান তুলনা করা যেতে পারে। তিনিও কেনানে একেশ্বরবাদ প্রচার করেছেন, সূর্যদেবকে ঈশ্বর বলেছেন[১] (অবশ্য সে মতটি পরে পাল্টেছেন), দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করেছেন এবং ঈশ্বরের নামে মন্দির (কাবা গৃহ) গড়েছেন। উভয়ে একই প্রকার কাজই করেছেন। অথচ তাদের একজন পেলেন পয়গম্বরী, আরেকজন হলেন কাফের।

এ যাবত যে সকল বিষয় আলোচনা করা হলো, তা সবই অতীত কাহিনী। বর্তমান প্রসঙ্গ হলো মোশি ও ফরৌণকে নিয়ে। এ হলো ইখনাটনের শতাধিক বছর পরের ঘটনা। মোশির সময় যিনি মিশরের ফরৌণ ছিলেন, তার নাম দ্বিতীয় রামেসিস (খৃ: পূ: ১৩১৭-১২৫১)। তার চরিত্র ছিলো ইখনাটনের চরিত্রের বিপরীত। ইখনাটনকে ধার্মিক বললে রামেসিসকে বলতে হয় বিধর্মী। নতুবা ইখনাটনকে বিধর্মী বললে রামেসিসকে বলতে হয় ধার্মিক ব্যক্তি। মূলত রামেসিস ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ শাসনকর্তা। তিনি মিশরীয়দের ধর্মকর্মে পুনঃ স্বাধীনতা দান করেছিলেন। জবরদস্তি করে কোনো দেবতার পূজা করতে বলেননি বা নিষেধ করেননি কাউকে তিনি ইখনাটনের মতো। ধর্মের স্বাধীনতা পেয়ে মিশরীয়রা পুনঃ নানা দেবদেবীর পূজা শুরু করলো এবং পুরোহিতরা তাঁদের সাবেক মর্যাদা ও ক্ষমতা ফিরে পেলেন।

১. পবিত্র কোরান – সূরায়ে আনআম, রু ৯, ৭৯ আ.

রামেসিস কারো ধর্মাধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাননি মোটেও, আধুনিক কালের শাসকদের মতোই। তিনি মনোযোগী ছিলেন দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, অর্থ ও শিলেপান্নতি বিধানে এবং রাজ্যবিস্তারে। তাঁর প্রধান কীর্তি হলো একটি পিরামিড ও দুটো মদির নির্মাণ।

মিশরের পিরামিডসমূহ পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। তারই একটি পিরামিডের নির্মাতা ফরৌণ রামেসিস। তাঁর নির্মিত পিরামিডটি আজো অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান আছে, হয় তার গর্ভে আছে প্রায় তিন হাজার বছরের পুরাতন তাঁর মৃতদেহটিও। তিনি যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ঐশ্বর্যে অতি উন্নত ছিলেন, তাঁর নির্মিত একটি পিরামিড ও মন্দির দুটােই তার জুলন্ত প্রমাণ। নিম্নোক্ত বিবরণটি দ্বারা উক্ত মদিরদ্বয়ের স্থাপকের যোগ্যতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

রাজা রামেসিস দুটো মদির গড়িয়েছিলেন নীলনদের তীরে উত্তর মিশরের আবু-সিম্বিলে। বড়টাতে আছে রাজার চারটি মূর্তি। লম্বায় এক একটা ষাট ফুট। আসোয়ান বাঁধ তৈরী করার সময় নীলনদের জলধারার স্ফীতির হাত থেকে মদির দুটোকে বাঁচাবার প্রশ্ন উঠে। আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার ফলে ইউনেসকোর (UNESCO) তত্ত্বাবধানে পাশ্চাত্য প্রকৌশলীদের মিলিত চেষ্টায় মদির দুটোকে ঠাঁইনাড়া করে ১৮০ ফুট ওপরে বসানো হয়। কয়েক বছর ধরে মাপজোক, হিসেবনিকেশ, আঁকা-জোকাতো ছিলোই, তার ওপর ছিলো নানা প্রাযুক্তিক সমস্যার সমাধানের প্রশ্ন। আধুনিক সব যন্ত্রপাতি এলো, কিন্তু পরিবহনের নানা যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও বিশাল সেই প্রস্তরদানবকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যই তৈরী করতে হলো আরো অনেকগুলো যন্ত্র। মূর্তিগুলোকে কেটে ফেলতে হলো টুকরো টুকরো করে, কেননা পৃথিবীর বৃহত্তম ক্রেনেরও সাধ্য ছিলো না সে দানবদের নড়াবার, ১৮০ ফুট ওপরে টেনে তোলা তো দূরের কথা।

যাই হোক, কাটা টুকরোগুলোকে নম্বর দিয়ে তাদের নতুন জায়গায় নিয়ে আবার জোড়া লাগানো হলো। আধুনিক যন্ত্রপাতির বিরাট সমাবেশ যারা দেখেছিলেন, তাঁরা অবাক

মনে প্রশ্ন করেছিলেন, "বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি ছাড়াই সেই প্রাচীন মিশরীয়রা প্রকাণ্ড এ মদির কেমন করে খাড়া করেছিলেন?”

ফরৌণ দ্বিতীয় রামেসিস ছিলেন মোশির সমকালীন মিশরের শাসনকর্তা। তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান, শৌর্য-বীর্য, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গুণ-গরিমা বিসর্জন দিয়ে তাকে এক কুৎসিৎ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে ‘খোদায়ী দাবীদার বলে। এর কারণ অনুমান করা চলে যে, তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মান্ধ ছিলেন না, ছিলেন ‘মুক্তমন-এর অধিকারী। মানব সমাজের বিভিন্ন দেশে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেখানে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির যাবতীয় গুণগরিমা ও সৌরভ-গৌরবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে বাস্তবাদিতার অপরাধে।

মোশির সর্বপ্রধান বিভূতি ছিলো নাকি তাঁর হস্তের আসা (লাঠি)। তিনি তাঁর হাতের আসাখানি ভূমিতে ছেড়ে দিলে তা নাকি সর্প হয়ে যেতো এবং জীবন্ত সপের ন্যায় চলাফেরা করতে পারতো ও শত্রুকে তাড়া করতো। মোশির জন্ম খ. পূ. ১৩৫৯ সালে এবং হযরত ইব্রাহিমের জন্ম খ. পৃ, ২৩৪০ সালে। **সুতরাং হযরত ইব্রাহিমের জন্ম মোশির জন্মের ৯৮১ বছর পূর্বে। সেই হযরত ইব্রাহিমের হাতে নির্মিত পবিত্র কাবা গৃহখানা আজও বিদ্যমান আছে। কিন্তু মোশির হাতের আসাখানা গেল কই?**

ভগবানের মৃত্যু

মাধব – কি বলছেন মশাই আপনি, ভগবান কি নেই?

নবীন — আমি শুনেছি যে, ভগবান নেই।

মাধব — ভগবান কোথায় গেছে?

নবীন — বোধ হয় যে, মারাই গেছে।

মাধব – কে বলেছে যে, ভগবান মারা গেছে, সংবাদদাতারা কেউ কি তার মৃত্যু স্বচক্ষে দেখেছেন?

নবীন — না, তা কেউ দেখেনি, ভগবানের কোনো বন্ধু-বান্ধব এমনকি তার স্ত্রী-পুত্ররাও তার মৃত্যু দেখেনি। সকলেই বলে অনুমান করে, তবে অনুমানটা সত্যি।

মাধব – ঘটনার বিস্তারিত খবর কিছু শুনেছেন কি?

নবীন — শুনেছি বেচারা ডুবিয়ে বায়লা মাছ ধরতে গিয়েছিলো গাঙ্গে, আর ফিরে আসেনি। কতোদিন গত হলো, কেউ তাকে কোথাও দেখেনি এবং শোনেওনি কোথায়ও তাকে দেখেছে বলে। হয়তো ভগবান জগতে নেই।

মাধব — আহা, বেচারা যদি মাছ ধরতে গাঙ্গে না যেতো, তাহলে তাকে এভাবে কুমীরের হাতে প্রাণ দিতে হতো না।

নবীন — না, এভাবে বা এ সময় না হলেও অন্যভাবে বা অন্য সময় ভগবানের মৃত্যু হতো। এইতো কমাস আগে ঈশ্বর ধোপা কলেরা ও খোদা বকস বসন্ত রোগে মারা গেলো ঘরে বসেই।

ঘটনাটি বাস্তব, ঘটেছিল ১৩২০ সালের ভাদ্র মাসের ১৩ তারিখে, লামচরি গ্রামের নমঃ পাড়ায়। সেখানে নদীর পাড়ে অনেক নমঃশূদ্রের বাস। ভগবান হালদার ছিলো সে

পাড়ার একজন অধিবাসী। পাড়ার লোকে তাকে 'ভগবান বলে ডাকতো। একদিন ভগবান হালদার নদীতে গিয়ে বায়লা মাছ ধরবার জন্য জলে ডুব দিয়ে আর উপরে উঠলো না। সকলে স্থির করলে যে, নিশ্চয়ই ভগবানকে কুমীরে খেয়েছে। সে আর কখনো ফিরে আসবে না এবং আসেওনি আজ পর্যন্ত। প্রথমোক্ত আলোচনাটি সেই ভগবান হালদারের দূরবর্তী দুজন আত্মীয়বন্ধুর মধ্যে তার সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা।

সাধারণত হিন্দুরা 'ভগবান এ নামটিকে ঈশ্বর-এর উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করে থাকে। আসলে ভগবান, ঈশ্বর, পরমেশ্বর বা নিরাকার ব্রহ্ম এক কথা নয়। **'ভগবান' হচ্ছে দেবরাজ ইন্দ্রের একটি কুখ্যাত উপাধি মাত্র।**

ইন্দ্র ছিলেন শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অতি উন্নত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। তাই তাঁর একনাম 'দেবরাজ। কিন্তু দেবরাজ হলে কি হবে, তাঁর যৌন চরিত্র ছিলো নেহায়েত মন্দ। তিনি তাঁর গুরুপত্নী অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করায় গুরুর অভিশাপে তাঁর সর্বাঙ্গে এক হাজার 'ভগ স্ত্রোীযোনি) উৎপন্ন হয় এবং তাতে ইন্দ্রের নাম 'ভগবান' (ভগযুক্ত) হয়। অতঃপর উক্ত ভগ চিহ্নগুলো চক্ষুরূপ লাভ করলে ইন্দ্রের আর এক নাম হয় সহস্রলোচন। ভগবান শব্দটি হচ্ছে ইন্দ্রের ব্যভিচারের একটি স্মারকলিপি, নিন্দনীয় বিশেষণ। কিন্তু কুখ্যাত ভগবান আখ্যাটি পেয়েও তিনি তাঁর ব্যভিচারে ইস্তফা দেননি। কিকিন্ধ্যার (মধ্যভারত) অধিপতি রক্ষরাজের পত্নীর গর্ভে 'বালী রাজের জন্ম হয়েছিলো ভগবান ইন্দ্রের ব্যভিচারের ফলে।

ভগবান ইন্দ্রের শেষ দেখা পাই আমরা পুরাণের পাতায় – হস্তিনাপুরে (পুরাতন দিল্লীতে) পাণ্ডুপত্নী কুন্তির গৃহে। সেখানে তাঁর অবৈধ যৌনাচারের ফলে কুন্তির গর্ভে জন্মলাভ করেন তৃতীয় পাণ্ডব 'অর্জুন'। এখানে ভগবান ইন্দ্রের আরো কিঞ্চিৎ পরিচয় দিচ্ছি।

ইন্দ্রের মাতার নাম অদিতি, পিতার নাম কশ্যপ এবং দাদা ছিলেন মরীচি। তাঁর ধর্মপত্নী শচীদেবী এবং ঔরসজাত সন্তান জয়ন্ত, ঋষভ ও সীদ্ধ। বাসস্থান ছিলো সুমেরু পর্বতের

অমরাবতী নামক স্থানের এক রম্য বাগানে। স্থানটির নাম ছিলো নন্দন কানন (আলোচ্য সুমেরু পর্বত হচ্ছে হিমালয় পর্বতের অংশবিশেষ)।

পাণ্ডুপত্নী কুন্তিদেবীর বাসরঘর ছাড়া দীর্ঘ তিন-চার হাজার বছরের মধ্যে - আজ পর্যন্ত কোনো পুরাণে বা নতুনে কোথায়ও ভগবান ইন্দ্রের আর দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি তাঁর বাপ, দাদা, স্ত্রী-পুত্রেরও না। হয়তো ভগবান ইন্দ্রের মৃত্যু ঘটেছে সবংশে। নতুবা তেনজিং, হিলারী ইত্যাদি আধুনিক কালের পর্বতারোহীদের সাথে তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ হতো। তবে ভগবান ইন্দ্র বা তার বংশাবলীর মৃত্যুও কেউ স্বচক্ষে দেখেনি, ভগবান হালদারের মৃত্যুর মতোই।

সহস্র ভগ অঙ্গে থাকায় ইন্দ্রদেব ভগবান আখ্যা পেয়েছিলেন। কিন্তু মহাদেব শিবকেও 'ভগবান' বলা হয়, অথচ তার দেহে 'ভগ ছিলো না একটিও। তত্রাচ তিনি 'ভগবান' আখ্যা প্রাপ্তির কারণ হয়তো এই যে, তিনি ছিলেন ভগবতীর স্বামী। স্বয়ং 'ভগযুক্তা' বলেই দুর্গাদেবী হচ্ছেন 'ভগবতী' এবং ভগবতী-এর পুংরূপে হয়তো শিব বনেছেন ভগবান। যদি তা-ই হয় অর্থাৎ **ভগযুক্তা বলে দুর্গাদেবী ভগবতী হন এবং ভগবতীর স্বামী বলে শিব ভগবান হয়ে থাকেন, তাহলে জগতের তাবৎ নারীরাই ভগবতী এবং তাদের স্বামীরা সব ভগবান।** কাজেই মানুষের জন্ম ও মৃত্যু মানে ভগবতী ও ভগবানেরই জন্ম-মৃত্যু। সুতরাং জগতে যতোদিন মানুষ আছে ও থাকবে, ততোদিন ভগবতী ও ভগবান আছেন ও থাকবেন। মানুষ না থাকলে থাকবে না জগতে ভগবতী বা ভগবান এবং ঘটবে তখন জগৎব্যাপী ভগবানের তিরোধান।

এতক্ষণ 'ভগবান' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হলো। শব্দের অর্থ ও ব্যক্তি-রূপ যা-ই হোক না কেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'সৃষ্টিকর্তা'কে উদ্দেশ্য করেই 'ভগবান' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু পুরাণ-শাস্ত্র ভগবান ইন্দ্রকে সৃষ্টিকর্তা বলে না, বলে ব্রহ্মাকে। আবার পৌরাণিক মতে ব্রহ্মার একজন স্ত্রী ও দুটি কন্যা ছিলো। স্ত্রীর নাম সাবিত্রী ও কন্যাদ্বয়ের নাম দেবসেনা ও দৈত্যসেনা। সুতরাং এ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও 'নিরাকার ঈশ্বর' নন। এভাবে

আদিমকাল থেকে সভাসভ্য মানব সমাজে কতো লোক যে কতোরূপে কতো সৃষ্টিকর্তা বা ভগবান সৃষ্টি করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এখানে কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি।

১. প্রাচীন মিশরীয়দের কারো কারো মতে সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন থোথ অর্থাৎ চন্দ্র এবং কারো মতে সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন 'রা বা 'রে অর্থাৎ সূর্য দেবতা।

২. প্রাচীন ফিনিশীয়দের মতে সৃষ্টিকর্তার নাম 'ক্রনস্থ। তার সামনে ও পেছনে চক্ষু এবং ছয়টি পক্ষ আছে। তার মধ্যে কয়েকটি সঙ্কুচিত ও কয়েকটি প্রসারিত।

৩. প্রাচীন ব্যাবিলনীয়দের মতে সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন 'অপসু ও তিয়ামত'। তারা হচ্ছেন জলদেবতা।

৪. আফ্রিকা মহাদেশের বন্য জাতিদের এক সম্প্রদায়ের লোকের বিশ্বাস — তাদের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন 'মান্টিস জাতীয় পতঙ্গ। তারা ঐ জাতীয় কাগণ বা 'ইকাগণ নামীয় পতঙ্গের পূজা করে থাকে।

৫. অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের ভিক্টোরিয়া প্রদেশের আদিম অধিবাসীদের মতে সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে পণ্ডজিল' নামীয় পক্ষী। ৬. আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম তীরের থিলিঙ্কিট ইণ্ডিয়ানদের মতে সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন 'জেলা বা 'জেলচ' নামক দাড়কাক। এক বৃহৎ খরগোস ইত্যাদি। কিন্তু ওদের এই সমস্ত সৃষ্টিকর্তা বা ভগবানগণের মধ্যে একমাত্র সূর্যদেব ছাড়া আর কেউই আজ পর্যন্ত জীবিত আছেন বলে মনে হয় না।

আদিম মানব সমাজে সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে উক্তরূপ শিশুসুলভ কল্পনা হাস্যকর হলেও ওর উৎপত্তির কারণ এখন আর অজ্ঞাত নয়। কোনো কোনো অবোধ শিশু যখন তার মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করে, "মা আমি এলাম কোত্থেকে?" তখন তার মা একটু বেকায়দায় পড়ে যায়। কেননা শিশুর সৃষ্টি অর্থাৎ তার ভ্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছুই জানে না, একমাত্র যৌনমিলন ছাড়া। আবার যেটুকু জানে, তা-ও প্রকাশ্যে বলতে পারে না। পক্ষান্তরে কিছু একটা না বললেও তার মুরুত্ববীয়ানা বজায় থাকে না। তাই আত্মমর্যাদা ও মুরুত্ববীয়ানা বজায় রাখার জন্য মা শিশুকে বলে – তুমি আকাশ থেকে পড়েছে,

তোমাকে পড়ে পেয়েছি বাগানে, তোমার বাবা তোমাকে কিনে এনেছে বাজার থেকে ইত্যাদি। তখন সরলমনা শিশু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে তার মায়ের বাণী। এভাবেই তৈরী হচ্ছিলো আদিম মানবদের ঐসব ঈশ্বর ও জগত সৃষ্টির উপাখ্যানগুলো মানুষের জাতীয় জীবনের শৈশবে। কিন্তু কোনো শিশু যদি মাতৃভক্তির আতিশয্যে যৌবনেও তার মায়ের ঐসব বাণী বিশ্বাস করে, তবে সে দুটি খেতাব পেতে পারে; তার একটি হচ্ছে মাতৃভক্ত অপরটি 'উন্মাদ'।

মানুষের জাতীয় জীবনের শৈশবে তৎকালীন অঞ্চলবিশেষের গোষ্ঠিপতি, মোড়ল বা সমাজপতিরা শিশুর মায়ের মতোই বুঝিয়েছেন অবোধ জনসাধারণকে বিশ্বসৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে নানান কালপনিক কাহিনী, যা বিশ্বাস করেছে তারা মনেপ্রাণে শিশুদের মতোই। বিশেষত পরবর্তীরা তা উপভোগ করেছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির মতো।

মানুষের জাতীয় জীবনের কৈশোরে আগেকার মতবাদগুলো আর পুরোপুরি বজায় থাকলো না, কিছুটা মার্জিত রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে ধর্মীয় মতবাদরূপে। **তখন সৃষ্টিকর্তা আবির্ভূত হলেন — পরমেশ্বর, পরমপিতা, যিহোভা, অহুরমযদা ইত্যাদি, শেষমেশ নিরাকার ব্রহ্ম। তা হলো যেনো ঝোপ কেটে জঙ্গল রোপণ করা।** আর আজও মহান তপস্বীরা সগৌরবে বাস করেন (তাঁদের মনোরম) সেই জঙ্গলে।

মানুষের জাতীয় জীবনের যৌবনে বিংশ শতকের এ বিজ্ঞানের যুগেও বিজ্ঞানীরা যখন পদার্থের পরমাণু ভেঙ্গে তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছেন, মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছেন এবং প্রস্তুতি নিচ্ছেন গ্রহান্তরে যাবার জন্য, তখনো তপস্বীরা গবেষণা চালাচ্ছেন 'মার্গ দিয়ে বদবায়ু বেরুলে তাতে ভগবানের আরাধনা চলে কি-না' — এই জাতীয় ব্যাপার নিয়ে।

আধুনিক দেবতত্ত্ব

প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ এরিক ফন দানিকেনের মতে – 'দেবতা বলে আমরা যে এক শ্রেণীর অস্তিত্ববিহীন কাল্পনিক জীবের নাম শুনে থাকি, তাঁরা সকলেই অস্তিত্ববিহীন কাল্পনিক জীব নন। বহু দেবতার বাস্তবতার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশের পুরাতত্ত্বের মাধ্যমে। গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন ও ভারতাদির পুরাণ-পুথিপত্তরসমূহে দেখা যায় যে, দেবতারা স্বর্গের অধিবাসী। তাঁরা এসেছিলেন স্বর্গদেশ থেকে পৃথিবীতে। বস্তুত তারা ছিলেন মহাকাশের কোনো অজানা গ্রহবাসী সুসভ্য মানুষ। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং সাংস্কৃতিক জীবনে তারা ছিলেন পৃথিবীবাসী মানুষের চেয়ে বহুগুণে উন্নত। মানুষ যেমন আজ মহাকাশযান তৈরী করে মহাকাশযাত্রা শুরু করেছে, প্রস্তুতি নিচ্ছে গ্রহান্তরে যাবার জন্য, এমনভাবে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁরা হাজার হাজার বছর পূর্বে। যার ফলে তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন 'পৃথিবী নামক আমাদের এ গ্রহটিকে। তাঁরা অবতরণ করেছিলেন ভূপৃষ্ঠে, বসবাসও করেছিলেন কিছুদিন কোনো কোনো দেশে কোনো এক যুগে। সে যুগের মানুষ তাদের অবয়ব, শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞান-গরিমা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলো। সেদিনের মানুষের কাছে তারা পেয়েছিলেন ভক্তি, অর্ঘ্য, নৈবেদ্য এবং দেব, প্রভু ঈশ্বর ইত্যাদি আখ্যা। যেমন পেয়েছিলেন কলম্বাস সাহেব আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের কাছে। দেবতারা রথে (বিমানে) চড়ে আবলীলাক্রমে যাতায়াত করতেন স্বর্গে ও মর্ত্যে। অর্থাৎ বিমানযোগে পৃথিবী ও মহাকাশে তাদের নিজ গ্রহে। কোনো কোনো অভিযাত্রীদল একবার অভিযান চালিয়ে স্বগৃহে ফিরে যেতেন, কোনো কোনো দল আস্তানা করতেন, কোনো কোনো দল স্থাপন করতেন উপনিবেশ। যারা আস্তানা-উপনিবেশ স্থাপন করতেন, যে উদ্দেশ্যেই হোক – তারা মানুষের কোনো দলপতি, সমাজপতি বা রাষ্ট্রপতিকে বশবর্তী করে তার মারফতে (মানুষের কল্যাণ কামনায়)

স্বমত প্রচার করতেন। তারা তাদের একান্ত ভক্তদের বর (আশীর্বাদ), রথ (বিমান) বা অস্ত্রাদি দান করতেন (অধুনা যেমন দান করে থাকে উন্নত দেশগুলো অনুন্নত দেশগুলোকে)। আবার অবাধ্য ব্যক্তিদের অভিশাপ দিতেন; আবশ্যক হলে যুদ্ধ করতেন।

ভাববাদী যিহিস্কেল (ইজেকিয়েল)-এর ঈশ্বরদর্শন সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবরণ দৃষ্ট হয় পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে। তাতে দেখা যায় যে, একদা (খৃ: পূ: ৫৯২) সদলে ঈশ্বর এসেছিলেন কবার নদীর তীরে যিহিকেলের সাথে সাক্ষাৎ করতে। দানিকেনের মতে – তা ছিলো গ্রহান্তরের কোনো এক বিমানবিহারী অভিযাত্রীদলের কবর নদীর তীরে অবতরণ। বিবরণটির কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

"আমি দৃষ্টি করলাম, আর দেখ, উত্তর দিক হইতে ঘূর্ণিবায়ু, বৃহৎ মেঘ ও জাজ্জ্বল্যমান অগ্নি আসিল এবং তাহার চারিদিকে তেজ ও তাহার মধ্যস্থানে অগ্নির মধ্যবর্তী প্রতপ্ত ধাতুর ন্যায় প্রভা ছিল। আর তাহার মধ্য হইতে চারি প্রাণীর মূর্তি প্রকাশ পাইল। তাহদের আকৃতি এই – তাহাদের রূপ মনুষ্যবৎ। আর প্রত্যেকের চারি চারি মুখ ও চারি চারি পক্ষ। তাহদের চরণ সোজা, পদতল গো-বৎসের পদতলের ন্যায় এবং তাহারা পরিকৃত পিতলের তেজের ন্যায় চাকচিক্যশালী। তাহাদের চারপাশ্বে পক্ষের নীচে মানুষের হস্ত ছিল। চারি প্রাণীরই ঐরূপ মুখ ও পক্ষ ছিল; তাহাদের পক্ষ পরস্পরসংযুক্ত; গমনকালে তাহারা ফিরিত না; প্রত্যেকে সম্মুখ দিকে গমন করিত।"[২] উদ্ধৃতাংশটির স্থূল মর্ম এই – বিদ্যুৎচালিত কোনো আকাশযানযোগে সেখানে অবতরণ করলো একদল অভিযাত্রী, সংখ্যায় তারা চারজন।

পুনশ্চ "আর তাহদের মস্তকের উপরিস্থ বিতানের উর্ধ্বে নীলকান্তমণিবৎ আভাবিশিষ্ট এক সিংহাসনের মূর্তি ছিল; সেই সিংহাসনের মূর্তির উপরে মনুষ্যের আকৃতিবৎ এক মূর্তি ছিল, তাহা তাহার উর্ধ্বে ছিল। তাহার কটির আকৃতি অবধি উপরের দিকে আমি প্রতপ্ত ধাতুর ন্যায় আভা দেখিলাম; এবং তাহার কটির আকৃতি অবধি নিচের দিকে অগ্নিবৎ আভা দেখিলাম; এবং তাহার চারিদিকে তেজ ছিল। বৃষ্টির দিনে মেঘে উৎপন্ন

ধনুকের যেমন আভা, তাহার চারিদিকে তেজের আভা সেইরূপ ছিল। ইহা সদাপ্রভুর প্রতাপের মূর্তির আভা। আমি তাহা দেখিবামাত্র উপুড় হইয়া পড়িলাম এবং বাক্যবাদী এক ব্যক্তির রব শুনিতে পাইলাম।

"তিনি আমাকে বলিলেন, হে মনুষ্যসন্তান, তুমি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, আমি তোমার সহিত আলাপ করিব। যে সময় তিনি আমার সহিত কথা কহিলেন, তখন আত্মা আমাতে প্রবেশ করিয়া আমাকে পায়ে ভর দিয়া দাড় করাইলেন, তাহাতে যিনি আমার সহিত কথা কহিলেন, আমি তাহার বাক্য শুনিলাম।"[৩]

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশের সারমর্ম এই– চারজন অভিযাত্রীর উপরে একজন সর্বাধিনায়ক ছিলেন। র্তার চেহারা ও শান-শওকত দর্শনে যিহিস্কেল বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকে উপুড় হয়ে সেজদা করলেন এবং ভয়বিহ্বল চিত্তে অভিভূত হয়ে তার বাণী শ্রবণ করলেন। অতঃপর তা সাধারণ্যে প্রকাশ করলেন ঈশ্বরের বাণী বলে। সে বাণীগুলো স্থান পেয়েছে পবিত্র বাইবেল গ্রন্থে। ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের নিকট ঈশ্বরের বাণী বলে তা একান্তই পালনীয় বিষয়। কিন্তু যিহিস্কেল ভাববাদীর ঐরূপ ঈশ্বর – দেব, মহাদেব, জাভে ইত্যাদি আর যা-ই হোন, তিনি নিরঞ্জন, পরমব্রহ্ম বা স্বয়ং আল্লাহ নন কিছুতেই।

এ প্রসঙ্গে সীনয় বা তুর পর্বতে হজরত মুসা (আ.)-এর 'জাভে নামক ঈশ্বর দর্শনের বিবরণটিও অনুধাবনযোগ্য। হয়রত মুসার ঈশ্বর দর্শন সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেল (তৌরিত) গ্রন্থে লিখিত বিবরণটি এরূপ – "পরে তৃতীয় দিন প্রভাত হইলে মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ এবং পর্বতের উপরে নিবিড় মেঘ হইল, আর অতিশয় উচ্চরবে তুরীধ্বনি হইতে লাগিল, তাহাতে শিবিরস্থ সমস্ত লোক কাঁপিতে লাগিল। পরে মোশি (মুসা আ.) ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লোকদিগকে শিবির হইতে বাহির করিলেন, আর তাহারা পর্বতের তলে দণ্ডায়মান হইল। তখন সমস্ত সীনয় পর্বত ধূমময় ছিল; কেননা সদাপ্রভু অগ্নিসহ তাহার উপর নামিয়া আসিলেন, আর ভাটির ধূমের ন্যায় তাহা হইতে ধূম উঠিতে লাগিল; এবং সমস্ত পর্বত অতিশয় কাঁপিতে লাগিল; আর তুরীর শব্দ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল। তখন মোশি কথা কহিলেন, এবং ঈশ্বর বাণী দ্বারা তাহাকে উত্তর দিলেন। আর সদাপ্রভু সীনয় পর্বতে, পর্বতের শিখরে, নামিয়া আসিলেন এবং সদাপ্রভু মোশিকে সেই পর্বতে ডাকিলেন, তাহাতে মোশি উঠিয়া গেলেন।"[৪]

উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো, তা আধুনিক কালের বিমান অবতরণের সময়েরই অনুরূপ এবং উক্ত বিবরণটিতে যে সমস্ত বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, যথা – মেঘ, বিদ্যুৎ উচ্চরব, গজন, তুরীধ্বনি, ধূম, পর্বতকম্পন, পর্বত শিখরে সদাপ্রভুর নেমে আসা ইত্যাদি, ওর কোনোটিই পরম ঈশ্বরের (আল্লাহর) অবতরণের সঙ্গে সম্পকিত নয়, বরং সম্পকিত বিমানবতরণের সঙ্গে। দানিকেনের মতে – কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই ওকে পরমেশ্বরের অবতরণ বলে মনে করতে পারেন না, পারেন জনৈক বৈমানিকের 'বিমানাবতরণ' বলে মনে করতে।

ইরানীয় ঋষি জোরওয়াষ্টার 'জেন্দআভেস্তা' নামক গ্রন্থখানা নাকি পেয়েছিলেন বজ্রবিদ্যুৎ সমাকীর্ণ ঘোর নিনাদ সম্বলিত স্বর্গগত ইরানীয় দেবতা 'আহুর মজদা-এর কাছে, কোনো এক পর্বতে বসে। অহুর মজদা নিরাকার ব্রহ্ম নন। কেননা তিনি ব্যক্তিসত্তার অধিকারী স্বর্গবাসী দেবতা।

খৃষ্ট ধর্মগুরু যীশু ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব পেয়েছিলেন স্বর্গগত একটি কবুতর পাখীর মাধ্যমে। এ বিষয়ে পবিত্র বাইবেল গ্রন্থের নিম্নোক্ত বিবরণটি দ্রষ্টব্য।

"পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া আমনি জল হইতে উঠিলেন, আর দেখ, তাহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন। আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত।"[৫]

উক্ত কবুতরটি স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন না এবং পৃথিবীর সাধারণ কবুতরও ছিলো না, ছিলো স্বর্গীয় কবুতর। কেননা পৃথিবীর সাধারণ কবুতরের কণ্ঠপ্রদেশে এমন কোনো স্বর্যন্ত্র নেই, যার দ্বারা সে মানুষের মতো কথা বলতে পারে। আর উক্ত বিবরণটি এমনই সরল-সহজ যে, ওর কোনো রূপকার্থ করার অবসর নেই। আকাশ বিজ্ঞানীদের মতে – আকাশ অনন্ত। আর অনন্ত আকাশে যদি 'স্বর্গ নামীয় কোনো স্থান থেকে থাকে, তবে তা হবে আকাশের কোনো গ্রহ-উপগ্রহ নিশ্চয়ই।

এ ক্ষেত্রে দানিকেনের মতে — যীশুর শ্রুত বাণীটি হয়তো কবুতররূপী বিমান-এ আগত ভিন্ন গ্রহবাসী কোনো মানুষের মুখের বাণী। নতুবা যীশুর ভাবালুতা।

প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্মপুস্তক আমদুয়াত গ্রন্থ, মৃতের গ্রন্থ ও ফটকের গ্রন্থত্রয়কে বলা হয় ঐশ্বরিক বা দৈবগ্রন্থ। ওর প্রণেতা নাকি মিশরীয় জ্ঞানের দেবতা থট এবং হাতের লেখাও নাকি তাঁরই সম্রাট হাবুরাবির হস্তে নাকি আইন গ্রন্থ প্রদান করেছিলেন সূর্যদেবতা 'সমাস'। প্রাচীন গ্রীকদেশের আইন প্রণেতা বলা হয় গ্রীকদেবতা 'ডাইওনিসাস-কে। হিন্দুদের বেদচতুষ্টয় রচিত হয়েছে নাকি দৈবশক্তিতে।

উক্ত আলোচনাসমূহের দ্বারা অনুমান হয় যে, সেকালের ধর্মীয় বিধিবিধান ও সামাজিক আইন-কানুনসমূহ প্রায় সমস্তই প্রণয়ন ও প্রবর্তন করেছেন স্বর্গবাসী দেবতা বা ঈশ্বর নামীয় ব্যক্তিরাই – মুনি-ঋষি, নবী-আম্বিয়া, কোনো সমাজপতি বা কোনো রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে।

সেকালে দেবতারা স্বর্গ থেকে নেমে আসতেন পৃথিবীতে বলতে গেলে ঘনঘনই। আর বিভিন্ন দেশে তাদের সংখ্যাও ছিলো অগণ্য। আরবের লাত-মানাত, কেনানে বাহু ইত্যাদি নানারকম ছিলেন দেবতা। **আবার বিভিন্ন দেশের কতক দেবতারা ছিলেন একই ধাঁচের। যেমন মিশরে – আসিরিস, আইসিস, হোরাস , ব্যাবিলনে – আলু, বেল, ঈয়া; ভারতে – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি**। যে যুগে সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বোধহয় যে এক

কোটিও ছিলো না, সে যুগে নাকি হিন্দুদের দেব-দেবীর সংখ্যা ছিলো প্রায় তেত্রিশ কোটি। ভারতীয় দেব-দেবীরা তো ঘাটিই করেছিলেন হিমালয় পর্বতের কোনো কোনো অঞ্চলে। শিবের ঘাটি ছিলো কৈলাস পর্বতে, নাম ছিলো তার কৈলাসপুরী এবং ইন্দ্রের ঘাঁটি ছিলো সুমেরু পর্বতে, নাম ছিলো তার অমরাবতী (এ সুমেরু পৃথিবীর উত্তর মেরু নয়, সে যুগের ভারতবাসীরা ভারতের উত্তরকেই পৃথিবীর উত্তর বলে মনে করত। আলোচ্য সুমেরু ও কৈলাস পর্বত হিমালয়েই অংশবিশেষ)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতারা সেখানেই থাকতেন সপরিবারে। ভারতীয় দেবতাদের অধিনায়ক (রাজা) ছিলেন ইন্দ্র, তার রাজপুরীর নাম ছিলো বৈজয়ন্তা। দেবরাজ ইন্দ্রের সে পুরকেই বলা হতো 'স্বর্গ। সেখানে ছিলো সুখ সাধনের নানাবিধ সামগ্রী। যথা – নন্দন কানন (এদন উদ্যান?), পারিজাত বৃক্ষ, সুরভি গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, ঐরাবত হস্তী, তৃপ্তিদায়ক আহার্য এবং দেবতাদের মনোরঞ্জনের জন্য ছিলো অপ্সরা, কিন্নর, গন্ধৰ্ব ইত্যাদি গীতনৃত্যশীলা অঙ্গনা। এ ছাড়াও ছিলো — রথ (বিমান), সারথি (বিমান চালক), ধনু বজ ইত্যাদি নানাবিধ যুদ্ধাত্র। সে সুরম্য স্থানটি লাভের অভিলাষে এবং অন্যান্য স্বার্থসিদ্ধির মানসে সেকালের ভারতীয় আর্যরা দেব-দেবীগণের তুষ্টির উদ্দেশ্যে করেছিলো নানাবিধ যাগযজ্ঞ, হাোম-বলি, স্তবস্তুতি এবং পূজা-অর্চনার প্রবর্তন ও প্রচলন।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, কোনো কোনো সময় কোনো কোনো দেবতা ভক্তের স্তুতিবাক্যে তুষ্ট হয়ে তাকে বর, অস্ত্র ইত্যাদি দান করতেন। হয়তো কাউকে রথ (বিমান) উপহার দিতেন। আবার কেউ বিদ্রোহী হলে তাকে সবংশে নিধন করতেন।

রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের স্তবে তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'পুষ্পক' নামক একখানা বিমান প্রদান করেন। কিন্তু সে বিমানখানা রাবণ ছিনিয়ে নিয়ে তিনি তার মালিক হন। দেবতারা এতে কোপিত হয়ে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। রাবণের পুত্র মেঘনাদ সেই বিমানখানার সাহায্যে দেবরাজ ইন্দ্রকে বিমানযুদ্ধে পরাজিত করে 'ইন্দ্রজিৎ' আখ্যপ্রাপ্ত হন এবং সেই বিমানখানার সাহায্যেই রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করেন। পরিশেষে

রাবণের মৃত্যু হলে রামচন্দ্র সীতাদেবীসহ ঐ বিমানখানা নিয়ে অযোধ্যায় যান। বোধহয় যে, যত্নাভাবে বিমানখানা সেখানেই বিনষ্ট হয়েছে। **পক্ষান্তরে সেকালের বীর্যবন্ত রাজা 'দণ্ডক' দেববিরোধী হওয়ায় ব্রহ্মা তার ব্রহ্মাস্ত্র (বোধহয়, এ কালের ডিনামাইট বা পারমাণবিক বোমা জাতীয় কোনো অস্ত্র) দ্বারা প্রজাপুক্তসহ রাজা দণ্ডককে সবংশে নিধন ও তার রাজ্যটি বিনষ্ট করেন। বহুকাল জনহীন থাকায় রাজ্যটি অরণ্যে পরিণত হয়।** রাজা দণ্ডকের সেই রাজ্যটিকেই বলা হয় 'দণ্ডকারণ্য' (অধুনা আবাদ হচ্ছে)। আবার পাশ্চাত্যে দেবতারা তাদের কোনো কোনো ভক্তকে নিয়ে বিমানবিহার করেছেন। পক্ষান্তরে দেববিরোধী জনগণকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে তাঁরা ধ্বংস করেছেন 'সদোম' ও 'যমোরা' দেশকে।

মুনিঋষি ও দেবদেবীগণ প্রায় একইকালে বর্তমান ছিলেন এবং প্রায় একইকালে ঘটেছে তাঁদের তিরোভাব। এযুগে দেখা যায় না ওঁদের কাউকে। ওঁরা সকলেই এখন কালের কোলে ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু দেবতারা নাকি সবাই অমর এবং গঙ্গা, মনসা, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি বহু দেবদেবী আজও বেঁচে আছেন। অথচ জাভে, অহুর মজদ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি দেবদেবীগণের কারো সাক্ষাৎ মেলে না। তারা গেলেন কোথায়? উত্তরে বলেছেন দানিকেন – **ঐ শ্রেণীর দেবতারা আসলে হচ্ছেন গ্রহান্তরের মানুষ। তাঁরা ফিরে গেছেন মহাকাশে আপন গৃহে, হয়তো এখন মারা যেতেও পারেন। কেননা দেবতারা দীর্ঘজীবী হলেও অমর নন।**

দেবতারা কোথায় গেলেন, তা বলেছেন দানিকেন সাহেব। কিন্তু কেন গেলেন, তা বলেননি তিনি। তবে তার মূল কারণ হয়তো যুগের সুযোগ-এর অভাব। সেকালের মানুষের মন ছিলো সরল, জ্ঞানের পরিধি ছিলো সংকীর্ণ। তাই তাদের গুরু পুরোহিতগণ যা বলতেন, তা তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও মান্য করতো অকাট্য-অভ্রান্ত বলে এবং দেবতাগণও স্বমত প্রচারের সুযোগ পেতেন তাঁদের ভক্তবৃন্দের মাধ্যমে। উত্তরোত্তর জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের গুরুবাদিতা হ্রাস পেতে থাকে। ফলে কমতে থাকে

দেবতাগণের মহিমা। অবশেষে **বুদ্ধ (জ্ঞানী) দেব যখন আবির্ভূত হয়ে প্রচার করলেন দেব-দেবীর স্তবস্তুতি ও পূজা-অর্চনার অসারতা-অযৌক্তিকতা, তখন থেকেই দেবতাদের পাত্তা গুটীতে হলো চিরতরে!** যদিও ভারতীয় দেবতাদের ঔপনিবেশিক স্বর্গধামটি আর্য ভারত থেকে বেশী দূরে নয়, তথাপি আর কোনো দেবদেবীর ভারতের ভূমিতে পদার্পণের কথা শুনা যায় না, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে। কেননা এ যুগে তাদের ভক্ত মুনি-ঋষি মেলে না। অভিন্ন কারণেই যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের পরে পশ্চিমাঞ্চলেও দেবতাদের আনা-গোনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

দেবতারা ছিলেন সর্ববিদ্যাবিশারদ, সর্বগুণে গুণী, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অতি উন্নত। ভক্তগণ তাদের অনুরক্ত হয়েছেন, ভক্তিরসে আলুত হয়ে অর্চনা আরাধনা করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যে অসংখ্য পশুবলি করেছেন (কেউ কেউ এখনো করে থাকেন) এবং নরবলিও দেওয়া হয়েছে কোনো কোনো দেশে। কিন্তু **দেবগণের কোনো জ্ঞান-গুণের অনুশীলন করেননি কোনো ভক্তই তা বলা চলে। কেননা অসংখ্য মুনি-ঋষিদের মধ্যে সে সম্বন্ধে নাম করা যায় একমাত্র ঋষি চরকেরই।**

তিনি নাকি চিকিৎসা তথা আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন দেবতা ব্রহ্মার কাছে। তাঁর প্রণীত ‘চরক সংহিতা’ নামক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা পুস্তকখানা আজো মানুষের কল্যাণ-সাধন করছে। এতদ্বভিন্ন আর কোনো দেবদত্ত প্রযুক্তিবিদ্যা কোনো মুনি-ঋষি আয়ত্ত করেছেন বলে শোনা যায় না। দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে তার ভক্তগণ প্রার্থনা জানাচ্ছে হাজারো রকম, স্তুতিবাক্য রচনা করেছে অজস্র (ঋকবেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি নাকি ছিলেন বজ্রবিদ্যুৎ সৃষ্টির অধিকর্তা (বিদ্যুৎ দ্বি-জ্ঞানীর)। কিন্তু কোন ঋষিই তাঁর কাছে উক্ত বিদ্যুৎ সৃষ্টির প্রণালীটি শিক্ষা করেননি বা করতে পারেননি। তা সৃষ্টির প্রণালী আবিষ্কার করেছেন ইটালীয় বিজ্ঞানী গ্যালভনি ও ভল্টা (১৭৬১)। **দেবতারা বিমানবিদায়ও ছিলেন সুনিপুণ। তাঁরা বিমানে রেখে) চড়ে আসতেন স্বর্গ থেকে মর্ত্যে (পৃথিবীতে), ভ্রমণ করতেন যত্রতত্র। হা-করে চেয়ে দেখতেন মুনি-ঋষিগণ, আর দান করতেন শ্রদ্ধাঞ্জলি।** কিন্তু

দেবতাদের কাছ থেকে বিমান তৈরীর কলা-কৌশল আয়ত্ত করেননি কোনো মুনি-ঋষিই তা আবিষ্কার করেছেন আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ১৯০৩ সালে।

এখন বিজ্ঞানীদের অসাধ্য কোনো কাজ আছে বলে মনে হয় না। তারা এখন উন্নীত হয়েছেন দেবতার পর্যায়ে। তবে কোনো দেবদেবীর আরাধনায় তা সম্ভব হয়নি, হয়েছে জ্ঞানের সাধনায়। বিজ্ঞানীদের চন্দ্রাভিযান সফল হয়েছে, তাঁরা এখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন গ্রহান্তরে যাবার জন্য। প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন গ্রহান্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে, বাক্যালাপ করতে। যদি তাদের গ্রহান্তরে গমন সম্ভব হয় এবং সেখানে থাকে যদি অনুন্নত জাতের মানুষ, তবে তাদের কাছে হয়তো তারাও পাবেন অর্চনা, আরাধনা, পূজা; পৃথিবীর দেবতাদের মতোই পাবেন 'দেবতা' বলে আখ্যা। কিন্তু তাঁদের সে দেবতাগিরি বজায় থাকবে ততোদিনই, যে পর্যন্ত না তারা জ্ঞান– বিজ্ঞানে উন্নত হয়। উন্নত হলে তাদেরও পাত্তা গুটাতে হবে তখন পৃথিবীর দেবতাদের মতোই।

২. যিহিস্কেল – ১ ; ৮-৯

৩. যিহিস্কেল – ১ ; ২৬-২৮ এবং ২ ; ২

৪. যাত্রাপুস্তক - ১৯ ; ১৬-২০

৫. মথি – ৩ ; ১৬-১৭

মেরাজ

বিমানবিহারের বাসনা মানুষের সার্বজনীন ও বহুকালের পুরানো এবং তা পূরণও করেছেন কেউ কেউ হাজার হাজার বছর আগেই। প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের ধর্মীয় ও পৌরাণিক পুঁথিপত্তরে তার বহু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই মানুষের উড্ডীন যান ছিলো পাখী। যেমন – **লক্ষ্মীদেবীর বাহন পেচক, সরস্বতীর বাহন হংস, বিষ্ণুর বাহন গরুড় এবং বাদশাহ নমরুদ নাকি উড়েছিলেন শকুন পাখীর সাহায্যে। আবার কেউ কেউ রথে (গাড়ীতে) চেপে উড়েছেন এবং বাদশাহ সোলায়মান নাকি উড়েছেন তার সিংহাসনে চেপেই।** কিন্তু এরা সবাই উড়েছেন পৃথিবীর কাছাকাছি, বায়ুমণ্ডলের মধ্যে, এঁদের কেউই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে যাননি বা যেতে পারেননি। তবে এঁরা সবাই উড়েছেন আপন আপন প্রচেষ্টায়। এ ছাড়া আর একভাবে মানুষ মহাকাশ (স্বর্গ?) ভ্রমণ করেছে। কিন্তু তা তাদের আপন প্রচেষ্টায় নয়। মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন তাঁরা ঈশ্বর প্রেরিত স্বগীয় দূতের আহানে স্বগীয় যানে আরোহণ করে। আর সেখানে তারা দেখেছেন অত্যাশ্চর্য ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, সাক্ষাৎ করেছেন ঈশ্বরের সাথে, আবার স্বর্গদূতেরা ফিরিয়ে দিয়ে গেছেন তাদের নিজ নিজ ঠিকানায়। এহেন মহাকাশ ভ্রমণকে ইসলামিক ভাযায় বলা হয় ‘মেরাজ’ বা ‘মেয়ারাজ’।

মুসলমানদের মতে ওভাবে মহাকাশ ভ্রমণ বা মেরাজ গমন করেছেন একমাত্র শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (দ)। বস্তুত তা নয়। **মহর্ষি এনক ঐভাবে মে'রাজ গমন করেছিলেন খ. পূ, প্রায় ৩০০০ অব্দে এবং মহর্ষি ইজেকিয়েল ও মহর্ষি ইলাইজা মে'রাজ গমন করেছিলেন খৃ পূ প্রায় ৬০০ অব্দে। খ. পূ. প্রায় ২০০০ অব্দে মহাপ্রবর ইব্রাহীম মে'রাজ গমন করেছিলেন বলেও শোনা যায়।** তবে তা তৌরিত তথা পবিত্র বাইবেলে

লিখিত নেই, তা জানা যায় অন্যান্য সূত্রে। আর শেষ নবী মেরাজ গমন করেন কোন তারিখে, তা তো মুসলমান মাত্রেই জানেন। এ সমস্ত মনীষীগণ প্রত্যেকেই মহাকাশে লক্ষ লক্ষ মাইল পথ ভ্রমণ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন অতি অলপ সময়ের মধ্যে। কিন্তু তখনকার সকল লোকে এবং আজও অনেকে তাঁদের সে মহাকাশ ভ্রমণের বিবৃতি বিশ্বাস করতে চায়নি। এমনকি ভ্রমণকারীদের আগনদলীয় কিছুসংখ্যক লোকও ছিলেন বা আছেন যারা ও বিষয়ে সন্দিহান।

উপরোক্তরূপ মহাকাশভ্রমণ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে সাম্প্রতিককালে, তা প্রকাশ করেছেন জর্জ অ্যাডামকি নামে জনৈক আমেরিকাবাসী। তাঁর সে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার আগে সংক্ষেপে তাঁর পরিচয়টা দিয়ে নিই।

জর্জ অ্যাডামকির জন্ম পোল্যাণ্ডে ১৮৯১ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে। যখন তাঁর বয়স প্রায় দুবছর, তখন তাঁর বাবা-মা আমেরিকা গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। তারা থাকতেন নিউইয়র্কের কাছে ডানকার্ক শহরে।

জর্জ স্কুলে বেশিদিন পড়তে পারেন নি। কিন্তু তাই বলে যে লেখাপড়া শেখেননি তা নয়। বরঞ্চ বাড়িতে পড়ে তার বয়সী বালক-বালিকা অপেক্ষা বেশীই শিখেছিলেন। যখন তিনি একটু বড় হলেন, মনে যখন কিশোর, তখন তিনি ভাবতে শুরু করলেন – মানুষ ঝগড়া-বিবাদ না করে মিলে-মিশে থাকতে পারে না কেন? তখন থেকেই তিনি ভাবুক। আকাশের প্রতি আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তিনি ইতিহাস এবং ভূগোল উত্তমরূপে পড়েছিলেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চান। কিন্তু জানতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার সঙ্গতি তার বাপমায়ের নেই। এজন্যে তাঁর কোনো অভিযোগ ছিলো না। তিনি নিজে কাজ করতেন, রোজগার করতেন; কিন্তু সংসারে দিয়ে এমন উদ্বৃত্ত থাকতো না যা দিয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারেন।

সারা দেশটাকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ভাবলেন। যেখানে যা বা যার কাছে যা পারলেন তিনি তাই শিখতে লাগলেন; কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাছেই হোক, লাইব্রেরীতেই হোক কিংবা মিউজিয়মেই হোক। শিক্ষা তাঁর সম্পূর্ণ হয়েছিলো।

১৯১৩ সালে জর্জ আর্মিতে যোগদান করেন। থার্টিন্থ ক্যাভালরির সঙ্গে তাঁকে ডিউটিতে পাঠানো হয় মেকসিকো সীমান্তে। ১৯১৯ সালে তিনি আর্মি থেকে ছাড়া পান। তাঁর কাজের প্রশংসা করা হয়েছিলো। ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে বড়দিনের দিন মেরি সিমবারকির সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো। আর্মি থেকে ছাড়া পেয়ে রুজি-রোজগারের চেষ্টায় জর্জ অ্যাডামস্কিক বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। এশহর থেকে ওশহর, ওগ্রাম থেকে এগ্রাম ঘুরে বেড়ান, যেখানে কাজ পান সেখানেই থেকে যান। এতে তাঁর অভিজ্ঞতাও বাড়ে প্রচুর, ভালোও লাগে ঘুরে বেড়াতে।

এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কাটিয়ে দেবার পর অ্যাডামস্কি স্থির করলেন – আর ঘুরে বেড়ানো নয়, এবার থিতু হয়ে বসা যাক। লাগুনা বিচ নামে একটি গ্রাম বেছে নিলেন এবং সেখানে তিনি মাষ্টারী আরম্ভ করে দিলেন।

১৯৪০ সালে অ্যাডামকি লাগুনা বিচ থেকে ভ্যালি সেন্টারে উঠে গেলেন। 'ভ্যালি সেন্টার' হলো ক্যালিফোর্নিয়ায় পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মানমন্দির মাউন্ট প্যালোমার যাবার রাস্তায়। তাঁর বাড়ির নাম 'প্যালোমার গার্ডেন'।

অ্যারিজোনার মরু অঞ্চলে ডেজার্ট সেন্টার গ্রাম। ১৯৫২ সালের ২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সেখানে মহাকাশ (ভেনাস গ্রহ) থেকে ফ্লাইং সসারে আগত জনৈক মহাকাশচারীর সাথে অ্যাডামকির সাক্ষাৎ হয়। সে সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখে তিনি প্রকাশ করেন ফ্লাইং সসারস্ হ্যাভ ল্যাণ্ডেড নামে একখানা যুগান্তকারী বই। অতঃপর ১৯৫৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ার ফ্লাইং সসারে চেপে দুজন মহাকাশচারী অ্যাডামস্কিকে তাদের সাথে মহাকাশ ভ্রমণে নিয়ে যায় এবং ভ্রমণান্তে তাঁকে পৃথিবীতে তাঁর নিজালয়ে

পৌঁছে দিয়ে যায়। এবারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে তিনি ইনসাইড দি ফ্লাইং সসার নামে আর একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উক্ত পুস্তকে জর্জ অ্যাডামকি তাঁর মহাকাশ ভ্রমণের যে বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, তার সাথে সেকালের মেরাজের কাহিনীসমূহের মৌলিক পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই।

এখন জর্জ অ্যাডামকির সে ভ্রমণকাহিনীর কিছু অংশ তাঁর নিজের কথায়ই বলছি – ১৯৫৩ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ার আমি লসএঞ্জেলস শহরে এসে পৌছলুম। আমি বাস করি শান্ত একটি শহরে আর লসএঞ্জেলসে যত মানুষ, তত গাড়ী, তত গোলমাল আর রাত্রিবেলায় চোখ ধাধানে আলো। এই শহর আমার ভালো লাগে না। তবুও আমাকে আসতে হয়েছে, কারণ আমি ডাক পেয়েছি। কিসের ডাক? শীঘ্রই জানা যাবে।

শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা হোটেলে আমি উঠেছি। নিজের ঘরে ঢুকে জানালা দিয়ে বাইরের আকাশে একবার চেয়ে দেখলুম। কেন? জানিনা। কোনো প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যে? তাও তো বলতে পারছি না।

এখন সবে বিকেল চারটি বেজেছে। নিচে ককটেল বারে কিছু লোক আমাকে চিনে ফেলল। খ্যাতির বিড়ম্বনা। ইতিমধ্যে আমার বই 'ফ্লাইং সসারস্ হ্যাভ ল্যাণ্ডেড' প্রকাশিতও হয়েছে, রেডিও ও টিভিতে বক্তৃতা দিয়েছি। ক্লাবে, কলেজ হলে, বিজ্ঞান সভাতেও বক্তৃতা দিয়েছি, কাগজেও ছবি ছাপা হয়েছে।

আমাকে ওরা এক জায়গায় বসিয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। আমার খারাপ লাগছিল না। কোথা দিয়ে তিন ঘটা কেটে গেল। নিজের ঘরে ফিরে গেলুম। পোশাক পাল্টে বাইরে খেয়ে এলুম।

একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। তাকে টেলিফোন করলুম। তিনি বললেন, আমাকে যেতে হবে না। তিনিই আমার হাোটেলে আসছেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা

পর্যন্ত কথা বলে মহিলা চলে গেলেন। আমি তাঁকে স্ট্রটকারে তুলে দিয়ে হােটেলের লবিতে বসে একটা সান্ধ্য সংস্করণ পড়তে লাগলুম।

কাগজ পড়তে ভালো লাগছে না। মন ভীষণ চঞ্চল। কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। এমন সময় দুজন যুবক আমার দিকে এগিয়ে এলো। দুজনেই আমার অপরিচিত। কিন্তু তারা যেন আমাকে অনেকদিন থেকে চেনে। এইভাবে তারা আমার দিকে এগিয়ে এসে একজন আমাকে ডাকল, মি. অ্যাডামস্কি।

দুজনকে দেখে মনে হয় উঠতি ব্যবসায়ী। একজন ছফুটের ওপর লম্বা, বয়স আন্দাজ তিরিশ। দেহবর্ণ ইংরেজীতে যাকে বলে রাষ্ট্রী। চোখের তারা ঘোর বাদামী, দৃষ্টিতে বেশ কৌতুক মাখা। মাথার কালো চুল ব্যাকাব্রাশ করা।

অপরজন মাথায় খাটাে, বয়স বোধহয় তিরিশ হয়নি, গোল মুখ বালকের মতো। বেশ ফর্সা, চোখের তারা নীলাভ ধূসর। মাথার চুল বাদামী এবং কোকড়ানো। কারও মাথায় টুপি নেই। দুজনে যেনো দুই ভিন্ন দেশের মানুষ।

দ্বিতীয় যুবক মি. অ্যাডামস্কি বলে হ্যাণ্ডশেক করবার জন্যে হাসিমুখে তার হাত বাড়িয়ে দিলো। তখনও আমি জানি না এরা কে? কিন্তু যেই আমি হ্যাণ্ডশেক করলাম, আমনি আমার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

এইতো ১৯৫২ সালের ২০ নভেম্বর তারিখে অ্যারিজোনার মরু প্রান্তরে ভেনাস গ্রহের সেই যুবক আমার সঙ্গে এইভাবে হ্যাণ্ডশেক করেছিল। এতক্ষণ আমার মনে সন্দেহ উকিঝুকি মারছিল, মারছিল, কিন্তু এবার আমি বুঝলাম এরা ভিন্ন গ্রহের মানুষ। কিন্তু দুজনের চেহারার এত পার্থক্য কেন? পার্থক্য কেন পরে জানতে পেরেছিলুম।

ওদের মধ্যে যার বয়স কম সে আমাকে বলল, আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনাকে আমরা এখন একটু বাইরে নিয়ে যেতে চাই। আপনার কি সময় হবে?

নিশ্চয় চলুন। আমি কিছু চিন্তা না করেই রাজি হয়ে গেলুম।
হোটেল থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লুম, আমি মাঝখানে, ওরা দুপাশে দুজন। এক জায়গায় অনেক গাড়ী রাখা ছিল। একটা গাড়ীতে আমাকে ওরা উঠতে ইশারা করে নিজেরাও উঠল। কমবয়সী যুবকটি ড্রাইভারের সিটে বসল। গাড়ীখানা আমেরিকায় তৈরী, কালো রং, বেশ বড়, পন্টিয়াক সিডান।

আমরা বসার সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়ী ছেড়ে দিল এবং যে কোন সুদক্ষ ড্রাইভারের মতো গাড়ী চালিয়ে নিয়ে চলল। পথ তার উত্তমরূপে চেনা বলে মনে হলো। আমার খুব অবাক লাগছিল, আমি কোনো কথা বলতে পারছিলুম না, মনে নানা প্রশ্ন।

নীরবতা ভঙ্গ করে অপর যুবকটি যেন আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল, আপনার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়, কারণ এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমাদের সম্বন্ধে কোনো কৌতুহল প্রকাশ করেননি, জিজ্ঞাসাও করেননি আমরা আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। আমি মৃদু স্বরে বললুম, আমি জানি তোমরা নিজেরাই বলবে।

মৃদু হেসে যুবক বলল, ঐ ছেলেটা যে গাড়ী চালাচ্ছে ও হলো মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা, যাকে তোমরা বল মার্স আর আমি আসছি শনি অর্থাৎ স্যাটার্ণ থেকে।

যুবকের বাচনভঙ্গি স্পষ্ট এবং উচ্চ কণ্ঠে কথা বলে। কথা বলার ধরণ এমন চমৎকার যে, অবিশ্বাস করার কোনো কারণ পাওয়া যায় না।

গাড়ী চালাতে চালাতে কনিষ্ঠ যুবক বলল, আমরা হলুম আমাদের গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগকারী ব্যক্তি, যাদের আপনারা বলেন 'কন্টাইম্যান' (সেকালের ফেরেস্তা?)।

আমরা পৃথিবীতে কয়েক বছর হলো আছি, গোড়ার দিকে আমাদের ইংরেজী উচ্চারণে কিছুটা জড়তা ছিল, কিন্তু এখন তা আমরা কাটিয়ে উঠেছি। আমরা এখন আপনাদের সঙ্গে মিশে গেছি। অন্য গ্রহের মানুষ বলে কেউ আমাদের চিনতে পারে না, অবশ্য আমরাও আমাদের পরিচয় কারো কাছে প্রকাশ করি না।

জ্যেষ্ঠ যুবক বলল, সেটা বিপজ্জনক হবে, তবে দেখুন, পৃথিবীর মানুষ তাদের যতটা না চিনতে পারে, আমরা তার চেয়ে বেশী চিনতে পারি।

আমি বললুম, বুঝেছি, তুমি বলতে চাইছ যে, আমি আমাদের আর একজন মানুষকে যতটা না চিনতে পারি, তার চেয়ে তোমরা আমাদের আরও ভালো করে চিনতে পার, এই তো? ঠিক তাই, আচ্ছা একটা কথা, আপনি তো বিশ্বাস করেন যে, অন্য গ্রহে আমাদের মতোই মানুষ আছে এবং এজন্য আপনাকে অনেক বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে, কারণ আপনাদের বিজ্ঞানীরা বলেন যে, অন্য কোনো গ্রহে জীবন অসম্ভব। অতএব আপনি যদি এখন গাড়ী থামিয়ে চিৎকার করে রাস্তার মানুষদের বলেন যে, দেখ এই দুটি মানুষ, এরা পৃথিবীর নয়, একজন মঙ্গল গ্রহের এবং অপরজন শনি গ্রহের – তাহলে অবস্থাটা কি হবে?

তাহলে আমাকে তো পাগল বলবেই এবং তোমাদেরও হেনস্থা কম হবে না। কেউ বিশ্বাসই করবে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আমার মনে কিন্তু এক মিনিটের জন্যেও সন্দেহ জাগেনি। আমি ওদের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছি। -

জ্যেষ্ঠ যুবক বলল, আমরা অবশ্য মাঝে মাঝে আমাদের গ্রহে ছুটি কাটিয়ে আসি। হ্যা, বলিনি, আমরা দুজনই এখানে চাকুরী করি এবং আমাদের মতো আরও অন্য গ্রহবাসী আছে।

আমার ইচ্ছে হয়েছিল, একবার জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি বিয়ে করেছ? তোমাদের বৌছেলেমেয়ে কি এখানে থাকে? কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হলো, না ওরা একাই থাকে। কে জানে ওদের গ্রহে বিবাহ করার রীতি আছে, না অন্য কোনোরকম রীতি আছে। টেলিপ্যাথির দ্বারা ওরা যদি আমার মনের কথা বুঝতে পারে, তা হলে ওরা নিজেরাই জবাব দেবে।

আমি আবার মনে মনে ভাবতে লাগলুম, পৃথিবীতে তো আরো অনেক লোক আছে এবং অনেক বিজ্ঞানীও আছেন যারা বিশ্বাস করেন অন্য গ্রহে মানুষ থাকতে পারে না। তা ভিন্ন গ্রহের এই বাসিন্দারা তেমন মানুষ বা বিজ্ঞানীর সঙ্গে যোগাযোগ না করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল কেন? অবশ্য বায়ান্ন সালে বিশে জুন তারিখে ভেনাসের সেই মানুষটি আমাকে বলে গিয়েছিল যে, আমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবে। কিন্তু এদের দুজনের মধ্যে কেউ তো ভেনাসের মানুষ নয়। কারণ যা-ই হোক, মনে মনে আমি কৃতজ্ঞ।

স্যাটারিয়ান অর্থাৎ শনিবাসী আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল, তোমার সঙ্গে কিন্তু আমরা প্রথম যোগাযোগ করলুম না, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু কেউ আমাদের বিশ্বাস করেনি, কেউ করেছে, সে কথা সে অপরকে বলেছে, তার কথা তো বিশ্বাস করেনি উল্টো প্রচুর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, এই ভয়ে বাকী ক'জন যারা আমাদের বিশ্বাস করেছে তারা আর মুখ খোলেনি।

প্রায় দেড় ঘটা গাড়ী চলল। কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছি না, বাইরে অন্ধকার (মে'রাজের ঘটনা সমস্তই ঘটেছে রাতে), এদিকের পথ-ঘাট আমি ভাল চিনিও না। আমিও জিজ্ঞাসা করিনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, ওরাও বলেনি।

সোজা রাস্তা ছেড়ে এবার গাড়ী ডানদিকে একটা কাঁচা রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। মঙ্গলবাসী বলল, তোমাকে আমরা অবাক করে দেব, অপেক্ষা কর।

মনে মনে বলি, অবাক তো করেই দিয়েছ।

যাই হোক, গাড়ী যাচ্ছে। রাস্ত নির্জন, কোনো গাড়ী বা মানুষ চলছে না। পনের মিনিট কাটল। কিন্তু দূরে ওটা কি? ঝিকমিক করছে, আবার অনুজ্জ্বল কি যেন একটা দাড়িয়ে আছে মাটির ওপর ।

গাড়ী যখন আরও খানিকটা এগিয়ে গেল, তখন চিনতে পারলুম, অ্যারিজোনার ডেজার্ট সেন্টারে তিন মাস আগে দেখা সেই রকম একটা ফ্লাইং সসার। ওরা ওটাকে বলল – স্কাউট (বোরাক?)।

এই সসার বা স্কাউট আমার দেখা সসারের মতো প্রায়, তবে এর কিছু বেশী বোধহয়, কুড়ি ফুট হবে।

গাড়ী থামল। স্কাউটের কাছে গাড়ী থেমেছে। গাড়ীতে বসে দেখতে পেলুম স্কাউটটির সামনে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ কি কাজ করছে। গাড়ী থেকে নেমে আমরা সকলে সেই স্কাউটের কাছে এগিয়ে গেলুম। কাছে আসতে মানুষটি ঘুরে দাঁড়াল, আরে এতো আমার পরিচিত সেই ভেনুশিয়ান।

সে হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করে বলল, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। লক্ষ্য করলুম, সেবার সে কথা বলেনি, আকারে-ইঙ্গিতে ও টেলিপ্যাথির সাহায্যে আমরা ভাববিনিময় করেছিলুম। কিন্তু এবার সে কথা বলল, তবে এদের মতো স্পষ্ট নয়।

সে আরও বলল, স্বকাউটটার একটা যন্ত্রাংশ খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সেটা এই ফাঁকে মেরামত করে নিলুম। কথা বলতে বলতে সে ছোট ধাতব একটা পদার্থ বালির ওপর ফেলে দিলো। আমি সেটা তুলে নিলুম এবং সেটি আমার কাছে এখনো আছে।

রাসায়নিকরা সেই ধাতুখণ্ডটি পরে পরীক্ষা করে রায় দিয়েছিলেন যে, এটি কোনো মৌলিক ধাতু নয়, একাধিক ধাতু মিশ্রিত অ্যালয়, তবে কি কি ধাতু মিশিয়ে অ্যালয় তৈরী হয়েছে তা তারা বলতে পারেননি।

আমি যখন সেই ধাতুখণ্ডটি তুলে নিয়ে পকেটে রাখছিলুম, তখন ভেনুশিয়ান মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল, ওটা নিয়ে কি করবে? আমি বলেছিলুম, পরে কাজে লাগতে পারে, তোমাদের সংস্পর্শে যে এসেছিলুম তার হয়তো প্রমাণ দিতে পারবো।

মৃদু হেসে ভেনুশিয়ান বলেছিল, তোমরা আর্থম্যানরা সুভেনির সংগ্রহ করতে ভালবাস, তাই না?
আমি প্রতিবাদ করিনি। আমিও মৃদু হেসেছিলুম।

এই ভেনুশিয়ানের সঙ্গে পরে আমার মাঝে মাঝে দেখা হয়েছিল, তবে মঙ্গলবাসী ও শনিবাসীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলুম। ওদের নাম জানিনা, জিজ্ঞাসাও করিনি। কিন্তু তাদের পরিচয়ের সুবিধের জন্য আমি মনে মনে ওদের নাম দিলুম। মঙ্গলবাসীর নাম দিলুম ফিরকন, শনিবাসীর নাম দিলুম রামু আর ভেনুশিয়ানের নাম দিলুম অরথন।

ফিরকন, রামু এবং অরথন এবার থেকে আমার সঙ্গী। পরে আরও সঙ্গী জুটেছিল। অরথন স্বাউটের ভেতর ঢুকবার সময় আমাকেও ভেতরে যেতে ইশারা করল। আমার হৃৎপিণ্ড বুঝি লাফিয়ে উঠলো। আমার আশা পূর্ণ হতে চলেছে। ফ্লাইং সসারের ভেতরে প্রবেশ করতে পারবো, হয়তো ওরা আমাকে মহাকাশে নিয়েও যাবে।

ফিরকন ও রামু আমাকে অনুসরণ করল। ফিরকন মনে সেই মঙ্গলবাসী বলল, কি তোমাকে বলেছিলুম না অবাক করে দেব?

অ্যাডামস্কি বলছেন, প্রথমেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ছোট একটি ঘরে। ঘর ছোট হলে কি হবে, দরজা কিন্তু বেশ উচু। ঘরে ঢুকবার সময় শনিবাসী লম্বা রামুকেও মাথা

নীচু করতে হলো না। ঘরে ঢুকে রামু মেঝের এক জায়গায় পা দিয়ে টিপতেই দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। মেঝের নিচে এবং স্কাউটের মাথায় কোথাও মৃদু একটা আওয়াজ হচ্ছে।

ঘরে ঢুকে আমি অবাক। কোনদিকে চাইব? ছোট ঘর হলেও দেখবার ও লক্ষ্য করবার মতো কত কি রয়েছে! দরজা বন্ধ, জানালাও দেখা যাচ্ছে না, চারিদিক বন্ধ অথচ নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে না। আরও লক্ষ্য করলুম যে, রামু ফিরকন বা অরথন মহাশূন্যে উঠবার জন্য বিশেষ কোনো পোশাক পরছে না বা আমাকেও পরতে দিচ্ছে না। তবে কি এরা আমাকে নিয়ে উপরে উঠবে না? সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলুম।

আমাকে এরা মহাশূন্যে বা অন্য কোনো গ্রহে নিয়ে যাক বা না যাক, আমি ততক্ষণে এই স্কাউটের গঠনপ্রণালী দেখে নিই।

প্রথমেই নজর করলুম, ঘরের মাঝখানে একটি স্তম্ভ, ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে। এই স্তম্ভটি নাকি মহাশূন্য থেকে চুম্বকশক্তি আহরণ করে আর সেই শক্তি হল এই স্কাউট চালক। স্তম্ভটি মেঝেতে দাড়িয়ে আছে বেশ বড় ও পরিষ্কার গোলাকার একটি লেন্সের ওপর। আর সেই লেন্স ঘিরে দুইপ্রান্তে দুটি অর্ধবৃত্তাকার বসবার বেঞ্চি রয়েছে।

লেন্সটির ব্যাস বোধহয় ছফুট হবে। লেন্সটির গঠন নিখুঁত। পরিষ্কার কিন্তু স্বচ্ছ নয়, অর্ধস্বচ্ছ।

ফিরকন আমাকে একটি বেঞ্চে বসতে বলল, নিজে আমার পাশে বসে যন্ত্রপাতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে লাগল। উল্টোদিকের বেঞ্চে বসল রামু আর অরথন গেল কন্ট্রোল রুমে।

এবার বোধহয় স্কাউট ওপরে উঠবে। আমার সেকি পুলক, কি উত্তেজনা। অরথন কন্ট্রোল রুমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ও রামুর সামনে রবারের মতো কোনো জিনিস দিয়ে তৈরী একটা বার ধীর গতিতে পড়ল। ফিরকন আমাকে ওটা ধরতে বলল। স্কাউট ওপরে উঠবার আগে ঝাকুনি প্রতিরোধ করবার জন্যে এই বার। আমাদের প্লেনের সিটবেল্ট আর কি। আমার কাছে সব অবিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু অবিশ্বাস করি কি করে? সবই তো আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

দেওয়ালে কয়েকটা বড় বড় চার্ট টাঙানো আছে। নানা রং, নানা চিহ্ন, কিছুই বুঝতে পারলাম । না, ওরাও বলল না। আমিও জিজ্ঞাসা করলুম না।

ফিরকন বলল, এই স্কাউট চালাবার জন্যে দুজন লোক দরকার হয়। সাধারণত এগুলিতে দুজন লোকই থাকে। তবে দুজনের বেশী লোক এরা বহন করতে পারে; এই আমরা এখন যেমন চারজন বসে আছি।

অরথনের কন্ট্রোল রুম দেখতে পাচ্ছি। জটিল কোনো যন্ত্রপাতি চোখে পড়ল না। অধিকাংশ কাজই বোতাম টিপে করা হচ্ছে। মনে হচ্ছে অরথনের সামনে যেন একটা অরগান রয়েছে, তার চাবি টিপে সে স্কাউট চালাচ্ছে।

নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা চোখে পড়ছে না তো? বিপদ ঘটলে এরা কি করে? প্যারাশুট থাকলেই বা কি হবে? প্যারাশুট খুলে মহাশূন্যে নামবে কোথায়? তবে কি মৃত্যুবরণ করে? নাকি আত্মহত্যা করে?

পাইলটের সিটের সামনে একটা পেরিস্কোপ রয়েছে। সেই পেরিস্কোপ দিয়েই পাইলট বাইরে দেখতে পায়। ফিরকন বলল, আমাদের এই স্কাউট ঠিক তোমাদের সাবমেরিনের মতো, নিচে দিয়ে না চলে জলের অনেক ওপর দিয়ে চলছে।

দেওয়ালে যে ম্যাপ ও চার্‌ট টাঙানো আছে, আমার নজর তখন সেদিকে, যদিও আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ইতিমধ্যে আমাদের স্কাউট ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছে, একবার শুধু একটু মৃদু ঝাকুনি অনুভব করেছিলুম। ম্যাপ ও চার্টের দিকে চেয়েছিলুম, কিন্তু হঠাৎ দেখি কি স্থানবিশেষে আলো জ্বলে উঠছে, বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন উজ্জ্বলতার। পাইলট অর্থাৎ অরথন মাঝে মাঝে সেদিকে চেয়ে দেখছে। মনে হলো সেই আলো পাইলটকে নির্দেশ দিচ্ছে।

আমরা যে ঘরে বসে আছি সে ঘরে কিন্তু কোথাও অন্ধকার নেই, এমন কি কোণগুলিও আলোকিত। আলোর রং যে কি, তা আমি বলতে পারব না; সাদা নয়, নীল নয়, নীলাভ সাদাও নয়, কি রকম তা বলতে পারব না। কিন্তু বেশ মৃদু আলো অথচ ঘরের প্রতিটি সামগ্রী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমাদের স্কাউট এখন পৃথিবী থেকে অনেক অনেক ওপরে উঠেছে। আমি শারীরিক কোনো অসুবিধা বোধ করছি না, নিশ্বাস নিতেও কোনো কষ্ট হচ্ছে না। স্কাউটের ভেতর নিশ্চয়ই একই বায়ুচাপ রক্ষিত হচ্ছে এবং অনন্তর অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

ফিরকন বলল, নিচের দিকে লেন্সটা দেখছ? এই লেন্সের অনেক গুণ। পৃথিবীর যে কোনো জিনিস স্পষ্ট ও বড় আকারে দেখা যায়। এমনকি বিশেষ একটি বস্তু বা ব্যক্তিকেও পৃথকভাবে নজর করা সম্ভব।

ফিরকন আরও বলল, এই রকম একটি লেন্স কাউটের মাথায় আছে। সেটি দূর আকাশ দেখতে সাহায্য করে। মাঝখানে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্তম্ভটি রয়েছে, ওটিই দূরবীনের কাজ করছে, আবার ওটিই এই স্কাউটের শক্তির উৎস।

দুটি পৃথক পর্দায় নিচের দিক ও ওপরের দিক দেখবার ব্যবস্থা আছে, যেন দুটি টি, ভি স্বকীন। আমি একটিতে আমাদের পৃথিবীর দৃশ্য এবং অপরটিতে নক্ষত্র দেখতে

লাগলুম। কয়েকটি চেনা নক্ষত্র দেখলুম। এগুলি আমার নিজের ১৫ ইঞ্চি টেলিস্কোপে দেখার চেয়ে আরও ভালভাবে দেখা গেল।

ফিরকন বলল, নিচের দিকে দেখ, লেন্সের ভেতর চারটে মোটা মোটা কেবল দেখতে পাচ্ছ? ওদের কাজ কি? বলছি। এই স্কাউটের নিচে তিনটে বল আছে। স্কাউট যখন নিচে নামে তখন বলগুলিও নীচে নামিয়ে দেওয়া হয়, তোমাদের প্লেনের চাকার মতো আর ওপরে ওঠবার সময় বল তিনটিকে গুটিয়ে নেওয়া হয়। বলগুলো ফাপা, ওগুলো বিদ্যুৎ ভাণ্ডার, মানে ওদের দুরকম কাজ। স্কাউটের ম্যাগনেটিক পোল থেকে তিনটে কেবল বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে তিনটি বলে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আর চতুর্থ কেবল-এর কাজ ভিন্ন, পাইলটের সামনে যে পেরিস্কোপ আছে সেই পেরিস্কোপ আর ম্যাগনেটিক পোলের সঙ্গে ঐ কেবল যুক্ত। কেবলগুলো সবসময় সক্রিয়। কিন্তু দেওয়ালের চার্টে আলো দেখে এদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে বেশিরভাগ যন্ত্রপাতি আছে স্বকাউটের নিচে।

স্কাউট বা কোনো যন্ত্র বিকল হলে কি কর? আমি প্রশ্ন করি।
স্কাউট ছাড়বার আগে ভাল করে দেখে নেওয়া হয়, সেজন্যে খারাপ হয় না। কিন্তু তবুও যদি খারাপ হয় সেজন্যে প্রতি স্কাউট একটা করে ছোট কারখানা ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আছে, ফিরকন বলল।

এরা আমাকে অনেক কিছু দেখাচ্ছে, অনেক কিছুর পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু কোন যন্ত্র কিভাবে কাজ করে তা বলছে না, জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর দিচ্ছে না।

অরথনের গলা শুনলাম, তৈরী হও, এবার আমরা বড় মহাকাশযানে প্রবেশ করব।
সে কি? এইতো পৃথিবীতে ছিলুম। কয়েক মিনিটে এত ওপরে উঠে এলুম? অরথন বলল, হ্যা, বেশী নয়, আমরা চল্লিশ হাজার ফুট ওপরে উঠেছি মাত্র, মাদারশিপ অপেক্ষা

করছে, প্রথম যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিনও এই মাদারশিপ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল, তোমরা সেদিন দেখেছিলে বোধহয়।

কথা বলতে বলতে অরথন পোর্টহোল খুলে দিল। পোর্টহোলের ব্যাস দেড় ফুটের মতো হবে। তার ভেতর দিয়ে নিচে এবং কিছু দূরে আমি মাদারশিপটি দেখতে পেলুম। শূন্যে এমন নিশ্চল হয়ে ভাসছে, যেন শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিরাট সিগারের আকারের সেই ক্যারিয়ারশিপ। ফিরকন বলল, ঐ ক্যারিয়ারশিপের ব্যাস দেড়শ ফুট এবং লম্বায় দুহাজার ফুট (ঈশ্বরের সিংহাসন?)।

অনতিবিলম্বে আমাদের স্বকাউট সেই ক্যারিয়ারশিপের ওপর এলো, ক্যারিয়ারশিপের পিঠে বিরাট একটা ডানা যেন সরে গেল আর সেই ফাক দিয়ে আমাদের স্বকাউট তার পেটের ভেতর ঢুকে পড়ল। এত আস্তে অবতরণ করল যে, আমি একটুও কঁকুনি অনুভব করলুম না।

স্কাউট থেকে আমরা বেরিয়ে এলুম। বাইরে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাতে একটা কেবল, কেবলের প্রান্তে কিছু একটা আটকানো রয়েছে। লোকটি আমাদের অভিবাদন জানিয়ে সেই কেবলটি স্কাউটের একটি অংশের সঙ্গে জুড়ে দিল।

আমি সেদিকে চাইতে রামু বলল, তোমাদের মটর গাড়ী যেমন পেট্রল পাম্পে দাঁড়ালে পাম্প থেকে নজল লাগানো হোসপাইপ দিয়ে পেট্রল ট্যাংকে পেট্রল ভরে দেওয়া হয়, এটাও সেই রকম করা হচ্ছে। তবে পেট্রলের বদলে আমরা অন্য শক্তি বা জ্বালানি ভরে দিচ্ছি। বাইরে যাবার জন্যে স্কাউট সব সময় প্রস্তুত রাখা হয়, কে জানে কার কখন ডাক পড়বে।

ভেতরটা বিরাট, প্রচুর জায়গা। এই ক্যারিয়ারশিপে ছটা স্কাউট থাকে। এর ভেতর যেমন কারখানা ও ল্যাবরেটরি আছে, তেমন সকল রকম আরামের ব্যবস্থাও আছে।

আমি শুধু ভাবছি, এত বড় একটা মহাকাশযান এমন নিশ্চল হয়ে কি করে দাড়িয়ে আছে।

একধারে মহাকাশযানটি চালাবার জন্যে বেশ বড় একটি কন্ট্রোল রুম রয়েছে। দেওয়ালে নানা রকম চর্ট, ম্যাপ, গ্রাফ। এর মধ্যে আবার এক জায়গায় একটি শক্তিশালী টেলিস্কোপ বসানো আছে।

সমস্ত মহাকাশযানটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কোনো গোলমাল নেই, নেই কোনো তাড়াহুড়োর লক্ষণ। একটা রেডিও রুম তো থাকা দরকার, কিন্তু সেরকম কিছু দেখা গেল না।

আমাকে বসতে বলা হলো। বসবার ব্যবস্থাও বেশ ভালো। সোফা, কৌচ, ডিভান এবং অনুচ্চ টেবিল দ্বারা সুসজ্জিত। সোফাগুলিও বেশ আরামপ্রদ। বেশ সুন্দর কোমল আলোয় মহাকাশযানটি আলোকিত। আমি আরাম করে বসলুম। যা কিছু দেখছি সবেতেই অবাক হচ্ছি। কিন্তু এবার যা দেখলুম তাতে আরও অবাক দেখলুম দুটি অপূর্ব সুদরী যুবতী (হুর-গেলমন?) আমার দিকে এগিয়ে আসছে। যুবতী এবং এত সুদরী মহাকাশচারী আমি আশা করিনি বলেই অবাক হলুম।

ওরা এসে প্রথমে তাদের হাত দিয়ে আমার হাত স্পর্শ করল এবং পরে অতি আলতোভাবে ওষ্ঠ দিয়ে আমার গাল স্পর্শ করল মাত্র। ওরা যে সুদরী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের ত্বক প্রায় স্বচ্ছ ভালো করে তাদের অনাবৃত দেহ দেখলে বোধহয় দেহের অভ্যন্তরের রক্ত চলাচল এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ দেখা যাবে। একজন আমাকে এক গ্লাস পানীয় দিল (শরাবুন তহুর?)। পান করলুম, শুধু জল কিন্তু একটু ঘন। তেষ্টা পেয়েছিল, সব জলটুকু পান করে ফেললুম। জল পান করতে করতে লক্ষ্য করলুম যুবতী দুটির পরনে গোড়ালি পর্যন্ত বুলওয়ালা এবং কবজি পর্যন্ত হাতওয়ালা একরকম

হালকা রঙের গাউন। সেই পোষাক কি কাপড়ের তা বলতে পারব না, তবে দেখে মনে হয় সিল্ক। পায়ে স্যাণ্ডাল।

দুটি মেয়ের গায়ের রঙে সামান্য পার্থক্য। দুজনেই ফর্সা, তবে একজন ওরই মধ্যে সামান্য মলিন শুনলুম সে মঙ্গলবাসিনী। আমি তার নাম দিলুম ইলমুখ আর অপরজন শুনলুম ভেনাসবাসিনী। তার নাম ভেনাস দেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আমি তার নাম দিলুম কালনা।

আমরা বসে কথা বলতে আরম্ভ করলুম। জানতে পারলুম যে, ওরা আরও বড় মহাকাশযান এবং দূরপাল্লার মহাকাশযান তৈরী করেছে। প্রতিটি মহাকাশযান স্বয়ংসম্পূর্ণ। ওরা মহাকাশে ঘুরে বেড়ায়। যে গ্রহে জীব আছে এবং তারা মানুষের মতই জীব, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করাই হলো তাদের উদ্দেশ্য। তারাও অনেকে মহাকাশযান তৈরি করেছে এবং তারাও অন্য গ্রহের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সেইসব গ্রহে যাওয়া-আসা করে। ব্যতিক্রম পৃথিবী। পৃথিবীবাসীরা গ্রহান্তরের জীবদের নাকি সুনজরে দেখে না।

আমি প্রশ্ন করলুম, তোমাদের ক্যারিয়ারশিপগুলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে কত মাইল? অরথন উত্তর দিল। সে বলল, মহাশূন্যে যে প্রবাহ বইছে আমরা সেই প্রবাহ অনুসরণ করে প্রবাহ স্রোতে ভেসে যাই। সেই প্রবাহ স্রোতের যে গতি, আমাদের গতিও তাই। অরথন আর ইলমুখ উঠে পড়ল। অরথন বলল, তাদের সময় হয়ে গেছে। আমি মনে মনে ভাবি, কিসের সময়? অরথন বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলো, বলল, দেখতেই পাবে।

একটু পরেই দেখি, ওরা দুজনে এলো পাইলটের পোশাক পরে। আমাদের পৃথিবীর পাইলটের মতো নয়। এদের পোশাক অনেক হাল্কা। দেখে মনে হয় যেন স্কি করতে যাচ্ছে। কিন্তু যারা কি করে তারা পশমের মোটা পোশাক পরে। এদের পোশাকের

স্টাইলটা সেই রকম কিন্তু অনেক হাল্কা। ওরা দুজনে এবার বিরাট স্পেস ক্যারিয়ার চালিয়ে নিয়ে যাবে।

কোথায় নিয়ে যাবে? কোনো একটি গ্রহে? মঙ্গল, ভেনাস, শনি? আমিই কি প্রথম মানুষ হবো এই গ্রহ তিনটির একটিতে অবতরণ করতে, নাকি আমার আগে ওরা অন্য মানুষ নিয়ে গেছে?

আমি বসে ফিরকন, রামু এবং কালনার সঙ্গে কথা বলতে লাগলুম। ওদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এইটুকু বুঝেছিলুম যে, ওরা আমাদের পৃথিবীর সমস্ত খবরই রাখে। মাঝে মাঝে কন্ট্রোল রুম থেকে অরথন বা ইলমুথ এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। ওরা আমার ওপর বেশ অনেক দিন থেকে নজর রেখেছিল এবং ঠিকই করে রেখেছিল যে, আমাকে ওরা ওদের মহাকাশযানে নিয়ে আসবে এবং ওদের নিজেদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানাবে, যাতে আমি নাকি সে সব কথা পৃথিবীতে ফিরে এসে মর্ত্যবাসীদের জানাতে পারি। জানাতে তো পারি এবং জানাচ্ছিও। কিন্তু আমার কথা ক'জন বিশ্বাস করবে? অথচ আমি যা বলছি এর প্রতিটি কথা সত্য — কেউ বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক।

এই তো ১৯৫১ সালে কোরিয়ার পশ্চিমে ইনচন উপসাগরে একটি সিপ্লেন থেকে সমুদ্রের ভেতরে একটি মিসাইল ক্ষেপণ করা হলো। উৎক্ষিপ্ত মিসাইলটি সবেগে সমুদ্রে ডুবে গেল, প্রতিক্রিয়ার ফলে সমুদ্রের জল একশ ফুট পর্যন্ত উচ্চে উঠল এবং একটু পরে দেখা গেল সেই শূন্যে মিলিয়ে গেল। ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল স্কটল্যাণ্ড থেকে কিছু দূরে সমুদ্রে। এই ঘটনা শুনে কেউ তা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু এ দৃশ্য বহু নরনারী প্রত্যক্ষ করেছে।

কন্ট্রোল রুম থেকে ইলমুথ একবার বেরিয়ে এসে বলল, আমরা এখন তোমাদের পৃথিবী থেকে পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে। ইলমুথ একটা পোর্টহেল খুলে দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল, ঐ তোমাদের পৃথিবী।

আমি দেখলুম – আমাদের পৃথিবীর ওপর সূর্যের আলো পড়েছে পৃথিবী জুলজুল করছে, কিন্তু চাঁদের মতো তার আলো স্নিগ্ধ নয়।

অন্ধকার আকাশে আমি দেখলুম কত নক্ষত্র, কেউ জোনাকির মতো ঝিকঝিক করছে, কারও দীপ্তি প্রখর, কারো ম্লান। আমি অভিভূত ও আমাকে সমস্ত ক্যারিয়ার দেখাল। বলল, এটা তো ছোট, এতে মাত্র তিরিশজন মানুষ আছে, কিন্তু আমাদের এমন স্পেসশিপ আছে যা হাজার হাজার মানুষ বহন করতে পারে।

আমি প্রশ্ন করি, সেই বিশাল স্পেসশিপের মালিক কোন গ্রহ?
কোনো গ্রহই নয়। যখন যার দরকার সে ব্যবহার করতে পারে। ইলমুখ বলল, তুমি বুঝি কেবল তিনটি গ্রহের কথা ভাবছ? এই মহাশূন্যে অনেক গ্রহ আছে, যেখানে সভ্য ও উন্নত মানুষ বাস করে। তাদের কেউ আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে, আবার অনেকে তোমাদের চেয়েও পিছিয়ে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে এখন কন্ট্রোল রুম থেকে চলে এসেছ, তা তোমার ডিউটি কে করছে?

কেন? রোবট আছে। সে এই স্পেসশিপ চালাচ্ছে। তবে কন্ট্রোল রুমে অরথন আছে, আমি ফিরে গেলে অরথন আসবে, তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

দেওয়ালে কয়েকখানা ছবি টাঙানো রয়েছে। বেশিরভাগ প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু আমার চোখের সামনে একটা দরজার মাথায় বেশ বড় একখানা ছবি টাঙানো রয়েছে। ছবিখানা দেখে আমার মনে হলো এ ছবি নিশ্চয়ই কোনো দেবতার।

সে দেবতার নাম কি? আমি কালনাকে প্রশ্ন করি — এ ছবি কি কোনো দেবতার? তাঁর নাম কি?

তোমরা যাকে দেবতা বল ইনি তা নন, তবে ইনি হলেন আমাদের মহত্তম পুরুষ। আমি একে দেখিনি, এর কত বয়স আমি জানি না, কোন গ্রহে থাকেন তা-ও জানি না, তবে শুনেছি এরই নির্দেশে আমরা পরিচালিত হই।

তোমাদের ভেতর কেউ দেখেনি? আমি প্রশ্ন করি।
হ্যা দেখেছেন, তাকে তুমিও শীঘ্রই দেখতে পারে, তোমাদের ভাষায় তিনি আমাদের প্রভু (ঈশ্বর)। আমরাও ক্কচিৎ তাকে দেখতে পাই। এই মহাকাশযানে তিনি আছেন, কিন্তু আজও তার দর্শন পাইনি। তোমাকে কিছু বলবার জন্য তিনি এসেছেন, তোমার সঙ্গে আমরাও তার দর্শন পাব, তার কথা শুনবো, তার দেওয়া উপদেশ পালন করব।

পৃথিবী ছাড়ার পর থেকে আমি বোধহয় মহাশূন্যে একঘন্টাকাল বিচরণ করছি, কিন্তু এর মধ্যে আমার মনের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। বসে বসে এইসব কথাই চিন্তা করছি।

হঠাৎ অনুভব করলুম আমার সামনের চেয়ারে কোনো জ্যোতির্ময় পুরুষ বসে আছেন। মুখ তুলে দেখি ঠিক তাই। তাঁকে দেখে আমার মনে হলো, আমি কি মীশুর সামনে বসে আছি? তাকে দেখছি?

না, ইনি যীশু নন, তবে নিঃসন্দেহে একজন মহাপুরুষ। শুনলুম এর বয়স হাজার বৎসর। সে কি? দেখে তো মনে হচ্ছে শত বৎসর পূর্ণ হতে এখনও অনেক দেরি।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে রামু বলল, আমরা যেমন পুরনো জামা ত্যাগ করে নতুন জামা পরি, ইনিও তেমনি পুরনো দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহে প্রবেশ করেন।

তিনি (মহাপ্রভু) কিন্তু আমার সঙ্গে খুব সাধারণভাবে কথা আরম্ভ করলেন। বললেন, তোমাকে আমরা আমাদের ছোট ও বড় আকাশযান দেখিয়েছি, নক্ষত্রলোকের সঙ্গে কিছু পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, যাতে তুমি পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে তোমার দেশবাসীকে এসব কথা বলতে পারো। পৃথিবী যে পারমাণবিক শক্তি নিয়ে পরীক্ষা করছে এবং মারণাস্ত্র তৈরী করছে, এজন্য তিনি শংকিত। পার্থিব মানুষের ঐখানেই ত্রুটি, তারা শান্তিতে বাস করতে পারছে না।

তিনি বললেন, আমাদের বিষয়ে তোমাদের কিছুই জানা নেই, আমরা আমাদের বিষয়ে জানাবার জন্যে দীর্ঘদিন থেকে চেষ্টা করছি, কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি না। তিনি অনেক কথা বললেন, যার মূল সুর হলো শান্তি।

তাঁর কাছ থেকে জানলুম যে, তাঁরা পৃথিবীতে মাঝে মাঝে সৎ মানুষ পাঠাচ্ছেন, যারা মানুষকে সংশিক্ষা দিয়ে উন্নত স্তরে পৌছে দিতে পারেন। যীশু হলেন এইরকম একজন মানুষ। যীশুকে তারাই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। পৃথিবী থেকে কিছু মানুষ তারা উঠিয়ে (মে'রাজে) এনে, তাদের শিখিয়ে আবার পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর মানুষ তাদের বুঝতে পারেনি, তাদের শিক্ষা গ্রহণ করেনি, তাদের তারা পাগলা গারদে নিক্ষেপ করেছে বা হত্যা করেছে।

বিদায় নেবার আগে তিনি বললেন যে, এখনও সময় আছে। তিনি আশা করেন যে, পৃথিবীর মানুষ সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে শান্তিতে বাস করবে। শেষ কথা বললেন, সেই মহত্তম পুরুষ যাকে আমরা মানবশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি, যার ছবি তুমি দেখতে পাচ্ছ, তাঁর আশীর্বাদ তোমার ওপর বর্ষিত হোক। পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে তুমি আমাদের কথা বোলো। তিনি বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে রামু ফিরকন, কালনা এবং অরথন এসে আমার সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করতে লাগল। মাঝে মাঝে ইলমুথ এসে যোগ দেয়।
বেশ আলোচনা চলছিল এমন সময় রামু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল এবার তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি, আজ সময় হয়ে গেছে। স্কাউট রেডি করা হয়েছে। ফিরকন আমাদের সঙ্গে

যাবে। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আমি রামু ও ফিরকনের সঙ্গে স্কাউট গিয়ে উঠলুম। রামু কন্ট্রোলের সামনে বসল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আমি চুপ করে বসে আছি। আমি যেন আমার মধ্যে নেই। মনকে কিছুতেই স্থির করতে পারছি না। কি দেখলুম, কি শুনলুম এবং কি করব, নানারকম চিন্তা, সকল চিন্তাধারাকে কিছুতেই একটি ধারায় আনতে পারছি না। কতক্ষণ যে এই অবস্থায় ছিলুম জানি না, ফিরকনের কথায় চমক ভাঙল, আমরা এসে গেছি, পৃথিবীতে পৌঁছে গেছি। এবার আমরা পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করছি না, মাত্র ছইঞ্চি ওপরে ভাসছি।

কন্ট্রোল থেকে উঠে এসে রামু আমার হাত স্পর্শ করে বলল, তোমাকে ফিরকন তোমার হোটেলে পৌছে দেবে। আশা করি তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

ফিরকন ও আমি স্কাউট থেকে বেরিয়ে এলুম। কিছুদূর হেঁটে গিয়ে গাড়ীতে উঠলুম। সেই পন্টিয়াক গাড়ী সেই নির্জন প্রান্তরে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। ফিরকন গাড়ী চালিয়ে আমাকে নিয়ে চলল। পথে একটাও কথা হলো না। আমি অভিভূত, কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছি। জানি না আমার মতো এই বিরল অভিজ্ঞতা আর কারও হয়েছে কি না!

হোটেলের সামনে থেকে গাড়ী থামিয়ে ফিরকন আমার হাত স্পর্শ ক্রে বলল, শিগগির আবার দেখা হবে, তোমাকে আমরা জানিয়ে জানিয়ে দেব মানে তুমি নিজেই অনুভব করবে – কবে, কখনও কোথায় আমাদের দেখা হবে (এর পরেও নাকি এ মহাকাশচারীদের সাথে জর্জ অ্যাডামস্কির একাধিকবার যোগাযোগ ঘটেছিল। শেষবারে ঘটেছিলো ১৬ মার্চ, ১৯৬২ সালে – লেখক)।

আমি গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে হাত তুলে ফিরকনকে বিদায় জানালুম। রাস্তা তখন নির্জন, একটিও লোক ছিল না। হোটেলে প্রবেশ করে নিজের ঘরে ঢুকলুম। এই প্রথম

আমার ঘড়ির কথা মনে পড়ল, দেখলুম শেষরাত্রি, ৫টা বেজে ১০ মিনিট। এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে মহাশূন্যে আমি অন্তত পঞ্চাশ হাজার মাইল ঘুরে এসেছি।

খাটের প্রান্তে বসে পড়লুম। শুতে ভুলে গেলুম। কিন্তু চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙল বেলা আটটার সময়।

ব্রেকফাষ্ট সেরে বাসে চেপে আমি প্যালোমারে ভ্যালি সেন্টারে আমার বাড়িতে ফিরে এলুম।[৬]

দূর অতীতের মানুষের কাছে স্বর্গ তথা আকাশ ভ্রমণ করাটা ছিলো একটি অলৌকিক ব্যাপার। তা বিশ্বাস করা শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিতেই সম্ভব ছিলো – ঐশ্বরিক ঘটনা বলে। অলৌকিকে বিশ্বাস রাখে এবং রাখে না, এমন কিছু মানুষ সেকালেও ছিলো এবং একালেও আছে। কিন্তু লৌকিকে বিশ্বাস রাখে না, এমন মানুষ সব যুগেই বিরল। কেননা বাস্তবকে অবিশ্বাস করার মানে নিজেকেই অবিশ্বাস করা।

মহাকাশ তথা স্বর্গ ভ্রমণ এখন আর অলৌকিক নয়, বর্তমানে তা হচ্ছে একান্তই লৌকিক ঘটনা। মানুষ চাঁদে অবতরণ করেছে, তা এখন গুরুবাদীরাও অস্বীকার করতে পারেন না। শুক্র, মঙ্গল ইত্যাদি গ্রহে রকেট পাঠানো হচ্ছে। নিকট ভবিষ্যতে হয়তো সেখানেও মানুষ অবতরণ করবে।

সৌরজগতের ভিতরে ও তার বাইরে নক্ষত্র-জগতের কোনো গ্রহে কোনোরূপ বুদ্ধিমান জীব আছে কি-না, তার খোজখবর নেওয়া হচ্ছে এবং তাদের সাথে বেতার যোগাযোগের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নাকি ইংগিতও পাওয়া যাচ্ছে দূর আকাশে বুদ্ধিমান কোনোরূপ জীব থাকার।

জর্জ অ্যাডামকির মহাকাশ ভ্রমণের বিবৃতিটি হচ্ছে লৌকিক ঘটনার একটি বাস্তবভিত্তিক বর্ণনা। জানি না আধুনিক সুধীমহল বিশেষত বিজ্ঞানীমহল তা কোন পর্যায়ে নিয়ে

যাবেন। অ্যাডামকির বর্ণনার বাস্তবতা প্রমাণিত হলে — দূরতীতের সকল মহাকাশচারীদের মহাকাশ্চারণও অনুরূপ সত্য, একথা 'অনুমান' করা অসঙ্গত নয়।

ঈশ্বর নিরাকার ও সর্বব্যাপী, ধর্মজগতে ইহা সর্বত্র স্বীকৃত। **ধর্মজগতের বাইরে নাস্তিকমহলে তথাকথিত ঈশ্বরকে মেনে নেয়া হয় না বটে, তবে তাঁরাও এমন একটি মৌলিক শক্তিকে 'বিশ্বনিয়ন্তা' বলে মেনে নিয়ে থাকেন যে, সে শক্তিও নিরাকার এবং সর্বব্যাপী**। এ ক্ষেত্রে আস্তিক ও নাস্তিক মতবাদে বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু **নাস্তিকরা – 'নিরাকার' অথচ 'সাকার', এরূপ দ্বিমুখী ঈশ্বরতত্ত্ব মেনে নিতে রাজী নন। তাই তাঁদের বলা হয় নাস্তিক।**

ধর্মজগতে সাকার ও নিরাকার – এ দুধরণের মতবাদ প্রচলিত থাকলেও নিরাকারবাদীগণও প্রকারান্তরে সাকারবাদীই বটে। যেহেতু বলা হয় যে, ঈশ্বর দেখেন, শোনেন, কথা বলেন, ক্রুদ্ধ হন, খুশি ও বেজার হন, সময়ে হাটাচলাও করেন এবং তিনি বসে আছেন মহাশূন্যের একটি নির্দিষ্ট স্থানে (সিংহাসনে)। সেখানে বসেই নাকি তিনি দূতের মারফতে পৃথিবীর মানুষকে সদুপদেশ দান করেন, যাবতীয় কার্য পরিদর্শন ও পরিচালনা করেন এবং সময় সময় পৃথিবীতেও আসেন; যেমন এসেছিলেন হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে বাক্যালাপ করার জন্য তুর পর্বতে।

মহাকাশ ভ্রমণকারী মনীষীগণ মহাকাশ ভ্রমণে গিয়ে যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং যার কাছে মানব-কল্যাণের জন্য নানাবিধ আদেশ-উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন — তিনি প্রভু, মহাপ্রভু যিনিই হোন, তিনি সর্বব্যাপী ও নিরাকার ঈশ্বর নন, নির্দ্বিতায় তা 'অনুমান' করা চলে।

৬. প্ল্যানেট মিসট্রি, চিরঞ্জীব সেন, ১ম প্রকাশ ১৩৮৬, পৃ. ৫৬-৬৪, ৬৬-৭৭

শয়তানের জবানবন্দী

বোশেখ মাস, আকাশ পরিষ্কার, বায়ু স্তর। রাতটি ছিল অতি গরমের। বৈঠকঘরের বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করছি; ঘুম আসে না গরমে। মনে হয় যেনো জাহাজে বয়লারের কাছে শুয়েছি অন্যত্র জায়গা না পেয়ে। মনটা ছোটাছুটি করছে তাপের লেজ ধরে কল্পনাজগতের নানা পথে। ভাবছি তাপ দুপ্রকার – কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক। কৃত্রিম তাপ কমানো যায়, বাড়ানো যায়, নতুবা তাপের উৎস থেকে দূরে সরে যাওয়া যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক তাপের বেলায় সবসময় তা পারা যায় না। আজকের এ তাপের উৎস হচ্ছে সূর্য। যার স্থানীয় তাপমাত্র ৬০০০ হাজার ডিগ্রী (সে) এবং দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। শোনা যায় যে, দোজখের আগুনের তাপ নাকি সে আগুনের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী। অর্থাৎ ৪,২০,০০০ ডিগ্রী (সে) এবং তা হবে মানুষের কাছে দূরত্বহীন। কেননা সে আগুনের ভিতরেই নাকি থাকতে হবে তাবৎ বিধমী বা অধার্মিক মানুষকে। তা-ও আবার দশ-বিশ বছর নয়, অনন্তকাল। মানুষের এহেন কষ্টভোগের কারণ নাকি একমাত্র শয়তান। তাই বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেই শয়তানের উপর অত্যন্ত ক্ষ্যাপা।

শয়তান নাকি পূর্বে ছিলো 'মকরম' নামে একজন প্রথম শ্রেণীর ফেরেস্তা এবং অত্যন্ত মুছল্লি। সে নাকি এতই খোদাভক্ত ছিলো যে, জগতে এতটুকু স্থান বাকি নেই, যেখানে তার সেজদা পড়েনি। কিন্তু আল্লাহতালার হুকুম মোতাবেক নাকি বাবা আদমকে সেজদা না করায় তার ফেরেস্তার পদ ও মর্যাদা নষ্ট হয়। তাই সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বাবা আদম ও তার বংশাবলীকে দাগা অর্থাৎ অসৎকাজে প্ররোচনা দিয়ে নাকি দোজখী বানাচ্ছে। সামান্য পদমর্যাদা হানির বিনিময়ে গোটা আদম জাতির অগণিত মানুষের দোজখবাসের কারণ হয়ে থাকলে শয়তান তো মানুষের সাধারণ শত্রু নয় –

মহাশক্র, পরমশক্র, মহাপরমশক্রই বটে। শয়তানের স্বভাব-চরিত্র, কার্যকলাপ ও বাসস্থান সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে শেষরাত্রে গরমটা কিছু কমে যাওয়ায় আরাম বোধ করতে লাগলাম এবং মনের ভাবনাগুলোও স্তিমিত হলো। এ সময় শুনতে পেলাম, কে যেন কোমল কণ্ঠে মৃদুস্বরে আমাকে দরজা থেকে ডাকছে।

আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম আগন্তুক আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সে এক সৌম্য মূর্তি। পরনে সাদা পাজামা, গায়ে সাদা জুব্বা, মাথায় (লেজওয়ালা) সাদা পাগড়ী এবং বুক ভরা সাদা দাড়ি, সুঠাম সুডৌল তেজোদীপ্ত চেহারা। তাঁর চোখেমুখে প্রকাশ পাচ্ছে আনন্দ ও বুদ্ধির জ্যোতি। জীবনে এমন মানুষ কখনো দেখিনি, কোনরূপ আবেগ উৎকণ্ঠ নেই, 'নতুন স্থান' বলে নেই কোন কিছু নিরীক্ষণের প্রয়াস। এখানের পথঘাট, গাছপালা ও ঘরবাড়ি যেনো তার সবই চেনা। ভাবলাম, লোকটা আলেম তো হবেনই, মুছল্লিও বটেন। কিছু দূরে থাকতে তিনি আমাকে শ্রদ্ধাভরে সালাম জানালেন, কাছে গেলে করমর্দন করলেন। আমি আমার বৈঠকঘরে প্রবেশ করে একখানা চেয়ার দেখিয়ে সসম্ভ্রমে তাঁকে বললাম – বসুন জনাব।

আগন্তুকটির পরিচয় জানার আগ্রহ নিয়ে আমি তার দিকে দৃষ্টিপাত করতে তিনি তা যেনো বুঝে ফেললেন এবং আমাকে বললেন, "আমার পরিচয় জানতে চান? আমার পরিচয় আপনি ভালো করেই জানেন। আর আপনি একাই নন, আমার পরিচয় সকল মানুষই জানে এবং ভালোভাবেই জানে। কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত আমাকে দেখেনি, দেখেননি আপনিও। পৃথিবীর জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সবখানে আমার অবাধ গতি। আমি সকল মানুষের সাথেই মেলামেশা করতে চাই, চাই ভালোবাসা করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার সাথে কেউ মেলামেশা করতে চায় না। আমার মাতাপিতা নেই; ছিলোও না কোনোদিন। আমি আল্লাহতালার নূরে তৈরী, কুদরতে সৃষ্টি, জন্মসূত্রে আমার নাম 'মকরম ফেরেস্তা', পরে 'ইবলিশ' এবং হাল নাম 'শয়তান'।"

আগন্তুকের নামটি শুনে আমি ভড়কে গেলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম যে, তার সাথে আমি কি কথা বলবো এবং কিভাবে বলবো। কোনো বিষয় কিছু ভাবতে সাহস হচ্ছে না। কেননা তিনি যেনো আমার মনের ভাবনাগুলোও দেখতে পাচ্ছেন। স্থির করলাম – কিছু ভাববো না, বলবো না কিছু নীরব-নিশ্চিন্তে শুনে যাব শুধু, যা বলবার তিনিই বলুন। এখন সমস্যা হলো যে আগন্তুককে সম্মান প্রদর্শন করবো কি করবো না। তবে বেশ-ভূষায় তো সম্মানের পাত্রই বটেন।

আমার মৌনভাব দেখে আগন্তুক যেনো আমার মনের কথা সমস্তই বুঝতে পারলেন এবং অনর্গল বলে যেতে লাগলেন, "যে কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে মুরব্বি বলা হয় এবং সভাসভ্য তাবৎ মানুষ জাতির মধ্যেই 'মুরব্বি ব্যক্তি সম্মানের পাত্র'। মানুষের মধ্যে কারো কোনো মুরব্বি ব্যক্তির বয়সের জ্যেষ্ঠতা সচরাচর দশ-বিশ কিংবা পঞ্চাশ-ষাট বছর, কদাচিৎ একশ'। কিন্তু আপনাদের আদি পিতা আদম যখন সৃষ্ট হন, আমি তখন বেশ সেয়ানা এবং আজো বেঁচে আছি। সুতরাং বয়সের হিসাবে শুধু আপনারই নয়, আমি সমস্ত মানুষ জাতির মুরব্বি।"

"আল্লাহ সর্বাগ্রে ফেরেস্তা বানিয়েছেন, পরে জীন বানিয়েছেন এবং সর্বশেষে বানিয়েছেন আদমকে। ইসায়ীরা সৃষ্টিকর্তাকে 'পিতা' বলেই সম্বোধন করে থাকে। কাজেই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে আদমকে আমার ভাইও বলতে পারি, তবে বয়সে কনিষ্ঠ। আপনাদের সমাজে বা মানব সমাজে কারো কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম (সেজদা) করবার রীতি আছে কি? হয়তো নেই। তা হলে আদমকে সেজদা না করে আমি নীতিবহির্ভূত কাজ করিনি, করেছি আল্লাহতালার আদেশ লঙ্ঘন। কিন্তু আদেশ যিনি করেছেন, তা লঙ্ঘন করার শক্তিও তিনিই দান করেছেন। জগতে কারো এমন কোনো শক্তি নেই, যার সে শক্তি দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাশক্তিকে পরাস্ত করে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে কার্যকরী করতে পারে। আল্লাহ জানতেন যে, আমি তাঁর হুকুমে আদমকে সেজদা করবো না, আদম তাঁর নিষেধ মেনে গন্ধম খাওয়া ত্যাগ করবে না এবং আদমের আওলাদরা তাঁর আদেশ-নিষেধ কেউ

মানবে, কেউ মানবে না। তা না জানলে তিনি আদমকে সৃষ্টি করার পূর্বে, বিশেষত আমাকে শয়তান বানাবার পূর্বে বেহেস্ত-দোজখ নির্মাণ করলেন কি করে, কি জন্য?"

"আমি লাখো লাখো বছর আল্লাহকে সেজদা করে এসেছি, এখনো করি। আমি বেঁচে থাকতে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করবো না, এ কথা তিনি জানেন এবং তিনি নিজেও বলেছেন, 'আমাকে ভিন্ন অন্য কাউকে সেজদা করো না'। আল্লাহর আসনে অন্য কাউকে বসালে তাতে তার গৌরব বাড়ে কি-না, তা তিনিই বোঝেন। তথাপি তিনি আদমকে সেজদা করার জন্য ফেরেস্তাদের হুকুম করার কারণ — এটা তার লীলা অর্থাৎ অন্তরের বাণী নয়।"

"আল্লাহ সাতটি দোজখ বানিয়েছেন, সবগুলোতে মানুষ থাকার জন্য। তিনি কি চান যে, আমি আমার দাগাকাজ বন্ধ করি, আর তার দোজখগুলো খালি থাক? তা তিনি চান না, চাইতে পারেন না। চাইলে তাঁর দোজখ বানাবার সার্থকতা ক্ষুন্ন হয়। আল্লাহর ইচ্ছা যে, কিছুসংখ্যক মানুষ দোজখবাসী হোক। আর আমাকে বলেছেন তার সেই ইচ্ছা পূরণে সহায়তা করতে। এ কাজ আমার পক্ষে করা ফরজ, না করা হারাম।"

"আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না, কেউই পারে না। বহু চেষ্টা করেও কোনো নবী-আম্বিয়া, দরবেশকে আমি দোজখবাসী করতে পারিনি। কেননা তাঁরা দোজখবাসী হোন, তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। পক্ষান্তরে হজরত ইব্রাহিম নমরুদকে, হযরত মুসা ফেরাউনকে এবং শেষ নবী (দ:) আবু জেহেলকে হেদায়েত করে বেহেস্তের তালিকায় নাম লেখাতে পারেননি আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও। কেননা তা আল্লাহর ইচ্ছা নয়।"

"আপনারা মনে করেন যে, আল্লাহর যতো সব রহমত মানুষের উপরই বর্ষিত হয়। বস্তুত তা নয়। আল্লাহর রহমত আমার উপর অনেক বেশী মানুষের তুলনায়। আদমকে সৃষ্টি করার কতো লাখ বছর পূর্বে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তা তিনিই জানেন। অথচ আল্লাহর রহমতে আমি আজও বেঁচে আছি। কিন্তু মানুষ বেঁচে থাকে মাত্র ৬০,

৭০ কিংবা ১০০ বছর। তদুপরি শিশুমৃত্যু-অপমৃত্যু যথেষ্ট। আমার সুদীর্ঘ জীবনে আজ পর্যন্ত আমি কোনোরূপ রোগ, শোক বা অভাব ভোগ করিনি, আল্লাহর রহমতে। কিন্তু মানুষ অসংখ্য রোগ, শোক ও অভাবে জর্জরিত। ফেরেস্তারা আমাকে লক্ষ্য করে তীর ছেড়েন আবহমান কাল থেকে। অথচ আল্লাহর রহমতে আমি নিরাপদেই থাকি। কিন্তু তাতে (বজ্রপাতে) ধ্বংস হয় সবকিছু মরে মানুষ। পবিত্র মক্কায় গিয়ে হাজী সাহেবরা আবহমানকাল আমায় লক্ষ্য করে পাথর ছোড়েন। কিন্তু আল্লাহর রহমতে তা আজ পর্যন্ত আমার গায়ে পড়েনি একটিও। অথচ সমুদ্রে জাহাজ ডুবে অসংখ্য হজযাত্রী মারা যান, আল্লাহর রহমতে।”

“আল্লাহর রহমতে আমি নিমেষে বিশ্বভ্রমণ করতে পারি, অদৃশ্যকে দেখতে, শ্রবণাতীতকে শুনতে, নিজে অদৃশ্য থেকে অন্যের মনের খবর জানতে। দুদিন অনিদ্রা-অনাহারে থাকলে মানুষ ঝিমিয়ে-নেতিয়ে পড়ে। আর আমি লাখ লাখ বছর ধরে অনিদ্রা-অনাহারেও সুস্থসবল আছি, সে তো আল্লাহর রহমতেই। বলা যাবে যে, মানুষ তো ওর অনেক কিছুই আয়ত্ত করে ফেলেছে। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, রেডিও, টেলিভিশন, রকেট ইত্যাদি যন্ত্র দিয়ে মানুষ এখন অদৃশ্যকে দেখছে, শ্রবণাতীতকে শুনছে, আকাশে-পাতালে ভ্রমণ করছে, অনাহারে বেঁচে থাকার গবেষণা চালানো হচ্ছে এবং কেউ তো অন্যের মনের ভাবও জেনে নিচ্ছে টেলিপ্যাথির সাহায্যে। এসব মানুষ আয়ত্ত করছে সত্য, হয়তো আরো অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করবে। কিন্তু সে সমস্ত যারা করেছেন ও করবেন, তাঁরা তো আমারই শিষ্য।”

“কোনো মানুষের অকল্যাণ আমার কাম্য নয় এবং তা করিও না। পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোতে এমন কতোগুলো বিধি-নিষেধ রয়েছে, যা মানুষের অকল্যাণই করে এসেছে আবহমান কাল থেকে। তাই মানুষের কল্যাণ কামনায় সে সব বিধি-নিষেধ অমান্য করার জন্য আমি মানুষকে প্রেরণা ছি। কেননা সেসব বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করার জন্য মানুষকে প্রেরণা দেওয়াই আমার কাজ। আর তারই ফল আধুনিক জগতে মানব জাতির জ্ঞান-

বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ক্রমোন্নতি। তথাকথিত ধর্মগ্রন্থগুলোতে আকাশতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব ইত্যাদি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য যাবতীয় তত্ত্বালোচনাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, ঘোষিত হয়েছে স্বর্গ ও নরক-তত্ত্ব, বিশেষভাবে।”

“মানুষ আজ সমুদ্রতলে বিচরণ করে, আকাশে পাড়ি জমায়, পরমাণুগর্ভে প্রবেশ করে এবং কতো অসাধ্য সাধন করে, কিন্তু এর কোনোটাই ধর্ম বা ধমীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মানুষকে শিক্ষা দেয়নি, বরং নিষেধ করেছে বারে বারে। আমার কর্তব্য বিধায় ওসব আমিই শিক্ষার প্রেরণা দিয়েছি ও দিচ্ছি মানুষকে, আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে। কিন্তু তাতে শুধু অধার্মিকরাই লাভবান হয়নি, ধার্মিকরাও ভোগ করছেন তার সুযোগ-সুবিধাগুলো পুণ্যার্জনের জন্য। জল, স্থল ও হাওয়াই যানের সাহায্য ছাড়া শুধু পদব্রজে পবিত্র হজ্জব্রত পালনে হাজীদের সংখ্যা কতোজন হতো, তা হিসেব করে দেখেছেন কি? বর্তমানে ওয়াজে, আজানে, পবিত্র কোরান তেলাওয়াতে, জানাজার নামাজেও মাইক, রেডিও, টেলিভিশন ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে পুণ্যের মাত্রা নিশ্চয়ই বাড়ছে। সুতরাং শুধু পাপকর্মের দ্বারা দোজখে যাবার জন্যই নয়, পুণ্যকর্মের দ্বারা বেহেস্তে যাবার জন্যও আমি মানুষকে সহায়তা করছি না কি? এছাড়া আমি হামেশা আল্লাহকে স্মরণ করি, তার হুকুম পালন করি, তাঁর এবাদত করি, কিন্তু দোজখ থেকে পরিত্রাণ বা বেহেস্ত লাভের প্রত্যাশায় তা করি না। কেননা দোজখের শাস্তি ও বেহেস্তের সুখ আমার কাছে অকেজো। যেহেতু নূরের তৈয়ারী দেহ আমার আগুনে জ্বলবে না এবং আহার-বিহার নিদ্রা ইত্যাদি না থাকায় (বেহেস্তের) সুখাদ্য ফল, সুপেয় পানীয়, স্বর্ণপুরী, সুদরী ললনা (হুর-গেলমান) ইত্যাদি আমার কোনো কাজেই আসবে না। পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবমাত্রেই আল্লাহর এবাদত করে থাকে। কিন্তু তারাও দোজখের ভয়ে বা বেহেস্তের লোভে তা করে না। অথচ মানুষ তা-ই করে থাকে। **ধর্মের নিশানধারীদের মধ্যে হাজারে বা লাখে এমন একজন মানুষ মিলবে কি-না সন্দেহ, যিনি নিছক আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই পুণ্যকাজ করেন, যার সাথে বেহেস্ত-দোজখের সম্পর্ক**

নেই। যারা দোজখের ভয়ে বা বেহেস্তের লোভে পুণ্যকাজ করে, তারা আমার চেয়ে অধম, পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট।”

“এ যুগের মানুষ আপনি, হয়তো কম্পাস দেখেছেন। ওর কাটার একটা প্রান্ত সর্বদা পৃথিবীর উত্তরে সুমেরুর দিকে এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণে কুমেরুর দিকে স্থির হয়ে থাকে। কেউ ওর ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। নাড়াচাড়া বা জোরজুলুম করে সাময়িকভাবে ওর কিছু ব্যত্যয় ঘটালেও, ছাড়া পেলে কাঁটা স্থির হয় গিয়ে সাবেক বিন্দুতে। কোনো কম্পাসের কাঁটাদ্বয়ের কোন প্রান্ত সুমেরু ও কোন প্রান্ত ‘কুমেরু মুখী থাকবে, তা নির্ধারিত হয় তার সৃষ্টিকর্তার (নির্মাতার) দ্বারা তখনই যখনই তিনি কাঁটটিকে সৃষ্টি করেন অর্থাৎ যখন কাঁটাটিকে ধন (পজিটিভ) ও ঋণ (নেগেটিভ) ধর্মী দুটি আলাদা জাতের বিদ্যুতের দ্বারা চুম্বকায়িত করেন। কোনো সাধারণ মানুষের সাধ্য নেই কম্পাসের কাঁটার দিকপাতনে ব্যত্যয় ঘটাবার, একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তা (নির্মাতা) ছাড়া। অনুরূপভাবেই মানুষের মানসরাজ্যেরও ‘সু’ ও ‘কু’ দুটি মেরু আছে। তবে তাকে মেরু বলা হয় না, বলা হয় ‘প্রবৃত্তি’। অর্থাৎ ‘সুপ্রবৃত্তি’ এবং ‘কুপ্রবৃত্তি’। সুপ্রবৃত্তি থাকে বেহেস্তমুখী এবং কুপ্রবৃত্তি থাকে দোজখমুখী হয়ে। মানবমনের এরূপ বৃত্তিবিভাগ করেছেন আল্লাহতা'লা মানবসৃষ্টির বহু পূর্বে। যে সময়টিতে আল্লাহ এ বিভাগ দুটি নির্ধারণ করেছেন, সে সময়টিকে বলা হয় ‘রোজে আজল’ বা ‘নিয়তি’।”

“রোজে আজল-এ নির্ধারিত ফলাফলের বিরুদ্ধে দাগ দিয়ে কোনো মানুষকে আমি দোজখী বানাতে পারি না এবং কোনো ধর্মপ্রচারকও হেদায়েত করে কোনো মানুষকে বেহেস্তবাসী করতে পারেন না। তবে সাময়িক মনের পরিবর্তন ঘটানো যায় মাত্র। কোনো কম্পাসের কাঁটাকে নেড়েচেড়ে বা জোর করে মেরুভ্রষ্ট করা হলে, ছুট পেলে পুনঃ যেমন সাবেক মেরুতে চলে যায়, মানুষের মানসকাঁটাও তদ্রুপই সুমেরুমুখী কোনো মানুষকে দাগ দিয়ে তার দ্বারা আমি অসৎকাজ করাতে পারি, এমন কি তাকে ‘কাফের’ নামে আখ্যায়িত করাতেও পারি। কিন্তু পারি না তার জীবনসন্ধ্যায় তওবা পড়ে ‘মোমেন’

হয়ে বেহেস্তে যাওয়া রোধ করতে। অনুরূপভাবেই কুমেরুমুখী কোনো মানুষকে হেদায়েত-নছিহত করে তার দ্বারা কোনো ধর্মপ্রচারক সৎকাজ করাতে পারেন এবং তাকে আখ্যায়িত করতে পারে 'মোমেন' নামে। কিন্তু তিনি পারেন না তার অন্তিম মুহূর্তে 'বেঈমান' হয়ে দোজখে যাওয়া রোধ করতে। এভাবে অনেক সমাজী কাফের বেহেস্তে যাবে। যাবে 'সমাজী মোমেন' দোজখে।"

"আল্লাহ যাঁকে দোজখবাসী করতে চান না, আমি শত চেষ্টা করেও তাঁকে দোজখী বানাতে পারি না। লক্ষাধিক নবী-আম্বিয়াদের প্রত্যেককেই আমি দাগ দিতে চেষ্টা করেছি এবং কিছু কিছু সফলও হয়েছি। কিন্তু আমি কাউকে দোজখী বানাতে পরিনি।"

"আমার দাগায় পড়ে তারা সামান্য গুনাহ যা করেছেন, আল্লাহ তার শাস্তি প্রদান করেছেন এ দুনিয়াতেই, পরকালে তাঁরা সবাই থেকেছেন নিষ্পাপ। যেমন – হযরত আদমের বেহেস্ত থেকে দুনিয়ায় নির্বাসন, হযরত ইউনুসের মৎস্যগর্ভে বাস, হযরত আইউবের বিমার, শেষ নবী (দ) এর খাদান শহিদ ইত্যাদি উক্তরূপ পাপেরই শাস্তি।"

"আজ পর্যন্ত আমি আল্লাহতা'লার মাত্র একটি হুকুমই অমান্য করেছি। তাঁর হুকুমে আদমকে সেজদা না করে। আর অন্য কজনও তো তাঁর হুকুম অমান্য করেছে প্রায় একই সময়, একই জায়গায় থেকে। কিন্তু সেজন্য তিনি রাগ করেননি বা কাউকে কোনোরূপ শাস্তি দেননি। জেবরাইল, মেকাইল ও এস্রাফিল ফেরেস্তাত্রয়কে আল্লাহ হুকুম করেছিলেন পৃথিবী থেকে মাটি নেবার জন্য, আদমকে বানাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু একে একে তিন ফেরেস্তাই আল্লাহর হুকুম খেলাপ করে ফিরে গেলেন তাঁর কাছে খালি হাতে, মাটির অসম্মতির জন্য। অবশেষে আজরাইল ফেরেস্তা আল্লাহর আদেশ মোতাবেক জোরপূর্বক কিছু মাটি নেওয়ায় তদ্দ্বারা আদমকে বানানো হলো। কিন্তু চারবার আদেশ অমান্য সত্ত্বেও আল্লাহ মাটিকে (দোজখের) আগুনে পোড়ালেন না, বরং পানি দিয়ে কাদা বানিয়ে মহানন্দে আদমের মূর্তি বানালেন ও তাতে প্রাণদান করলেন। আর তিন ফেরেস্তা যে তাঁর হুকুম অমান্য করলেন তুচ্ছ মাটির কথা মেনে, তা যেনো তাঁর খেয়ালই হলো

না। পক্ষান্তরে তাঁর হুকুম অমন্যের দায়ে আমাকে নাকি দিলেন অভিশাপ, আমার গলায় দিলেন লানতের তাওক এবং নির্বাসিত করলেন বেহেস্ত থেকে দুনিয়ায় চিরকালের জন্য। এসব কি তাঁর পক্ষপাতিত্ব বা ন্যায়বিরোধী কাজ নয়? না, এতে তিনি এতটুকু পক্ষপাতিত্ব বা অন্যায় করেননি। বরং অন্যায় করেছে মানুষ, তার ইচ্ছে ও উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে।"

"বলা হয় যে, আমি অভিশপ্ত, তিরস্কৃত ও নির্বাসিত হয়েছি। বাস্তবে তার একটিও না। এ বিষয়ে একটু খোলাসা করেই বলি।"

"প্রথমত আমি আল্লাহর বিরাগভাজন ও অভিশপ্ত হয়ে থাকলে তিনি আমাকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করতে পারতেন, পারতেন রোগ, শোক, দুঃখ-কষ্ট ও অভাব ভোগ করাতে, যেমন করেছেন হারুৎ-মারুৎ ফেরেস্তাদ্বয়কে। সর্বোপরি পারতেন মৃত্যু ঘটিয়ে জগত থেকে আমাকে নিশ্চিহ্ন করতে। কিন্তু তিনি তার একটিও করেননি। বরং উল্টোই করেছেন। যদি কেউ কাউকে বলে, 'তুমি রোগ, শোক, দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করে – তাহলে সেটা কি তার পক্ষে আশীর্বাদ না অভিশাপ? আল্লাহ আমাকে কোনো রোগ দেননি, শোক দেননি, অপমৃত্যু দেননি, কোনো অভাব দেননি, বরং দীর্ঘায়ু দান করেছেন। এসবের মধ্যে অভিশাপ কোনটি?"

"দ্বিতীয়ত বলা হয়ে থাকে যে, আমি তিরস্কৃত হয়েছি। অর্থাৎ আল্লাহ আমার কণ্ঠে লানতের তাওক দান করেছেন। এ কথাটিও পুরো ঠিক নয়। আমি "তাওক একটি পেয়েছি ঠিকই। তবে সেটা কাঠের না লোহার না স্বর্ণের তৈরী, কেউ তা দেখেননি বা শোনেননি কারো কাছে আজ পর্যন্ত। ওটা কারাবাসীর কণ্ঠে যেমন তিরস্কার (তাওক), তেমন বিজয়ীর কণ্ঠে পুরস্কার (মেডেল) সূচিত করে। তারতম্য শুধু গঠন ও উপকরণে। এ বিষয় পরে বলবো।"

"তৃতীয়ত বলা হয় যে, আমি বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হয়েছি, নির্বাসিত হয়েছি পৃথিবীতে। আল্লাহর আদেশে পৃথিবীতে আসা-যাওয়া অথবা স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাঁর নির্দেশিত কর্তব্য তো অন্যান্য ফেরেস্তাগণও পালন করে থাকে। তারাও কি নির্বাসিত? জেবরাইল ফেরেস্তা সংবাদ বহন ও আজরাইল ফেরেস্তা মানুষের জান কবজ করার উদ্দেশ্যে না হয় পৃথিবীতে আসে ও চলে যায়। কিন্তু মিকাইল ফেরেস্তা পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারে না আবহাওয়া বিভাগের কাজ বন্ধ করে। কেরামান ও কাতেবীন ফেরেস্তাদ্বয় রোজনামচা (ডাইরী) লেখা ছেড়ে দিয়ে মানুষের কাঁধ থেকে এক পা বাইরেই দিতে পারে না এবং মনকির ও নকিরকে তো জীবন কাটাতে হচ্ছে মানুষের কবরে কবরেই পৃথিবীতে। এরা যদি নির্বাসিত বলে সাব্যস্ত না হন, তবে আমি নির্বাসিত হই কোন বিচারে? আমিও তো আল্লাহর আদেশে আমার কর্তব্য পালন করে যাচ্ছি পৃথিবীতে বসে। বরঞ্চ আমি ওদের প্রত্যেকের চেয়ে মুক্ত ও স্বাধীন।"

"জেবরাইল ফেরেস্তা সংবাদবাহক। সে আল্লাহর সকালের আদেশ কারো কাছে বিকেলে পৌছাতে পারে না। মেকাইল ফেরেস্তা আবহাওয়া পরিচালক ও খাদ্য পরিবেশক। সে আল্লাহর সকালের আদেশের বৃষ্টি বিকেলে এবং বাংলাদেশের বৃষ্টি আরবদেশে বর্ষাতে পারে না, পারে না ধনীর খাদ্য গরীবকে দান করতে। এভাবে প্রত্যেক ফেরেস্তাই আছে তাদের নিজ নিজ কর্তব্যের নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ। কিন্তু আমার কর্তব্য (পরীক্ষা) কাজ সম্পাদনে আল্লাহ আমাকে এরূপ কোনো নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেননি। আমার পরীক্ষাকাজের সকাল-বিকাল নেই বা শীত-বসন্ত নেই, এশিয়া-ইউরোপ নেই; নেই যুব-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব পার্থক্যের নির্দেশ। বস্তুত আমি বিতাড়িত বা নির্বাসিত নই, অন্যান্য ফেরেস্তাদের মতোই আমি কর্তব্যের খাতিরে প্রেরিত হয়েছি পৃথিবীতে। আমি আল্লাহর মনোনীত ফেরেস্তা — বিশ্ববাসীর বিশ্বাসের পরীক্ষক (একজামিনার)।"

"বলা হয় যে, আদমকে সেজদা না করায় আমি ঘৃণিত ও অধঃপতিত হয়েছি এবং আদমকে গন্ধম ভোজন করিয়ে মানুষের শত্রু হয়েছি। বাস্তবে তা নয়। বরং পুরস্কৃত

হয়েছি ও পদোন্নতি লাভ করেছি এবং মানবকুলের বন্ধুর কাজই করেছি। আমার কথা শুনে আপনি একটু তাজ্জব হলেন বুঝি। এ বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলি।”

“ফেরেস্তারা নূরের তৈরী। তাই পাক-সাফ বটে, তবে ওদের বুদ্ধি নেহাত কম। নিজেরা কোনো কাজই করতে পারে না আল্লাহর হুকুম তামিল করা ছাড়া। ‘হা হুজুর’ ছাড়া না হুজুর বলার ওদের অভ্যাস নেই। তবে একদিন ‘না হুজুর’ বলেছিলো, কিন্তু তা খাটনি। আল্লাহ পৃথিবীতে মানবজাতি সৃষ্টির পরিকল্পনা ঠিক করে আদমকে বানাবার পূর্বে ফেরেস্তাগণের আক্কেল পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। তাতে তারা আল্লাহকে বলেছিলেন, ‘আদমীরা আপনার হুকুম-আহকাম মানবে না বা এবাদত করবে না। সুতরাং আদম সৃষ্টি না করাই উত্তম।’ মানবজাতির পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহ ফেরেস্তাদের সে উপদেশ অগ্রাহ্য করে আদমকে বানালেন। কিন্তু আল্লাহ যদি ফেরেস্তাদের প্রস্তাব মেনে আদমকে না বানাতেন, তাহলে মানবজাতির এ দুনিয়াস্ত্রীতির কি দশা হতো?”

“আদমকে বানিয়ে আল্লাহ ফেরেস্তাদের ডেকে বললেন – তোমরা আদমকে সেজদা করো। আল্লাহর হুকুম পেয়ে সব ফেরেস্তা একযোগে অর্থাৎ জামাতের সহিত এক রাকাত নামাজ আদায় করলেন আদমকে কেবলা করে। কিন্তু আমি সে নামাজ পড়লাম না। আল্লাহর আসনে আদমকে বসিয়ে তাকে সেজদা করতে আমার বিবেক বাধা দিলো। আমার বিবেক বললো যে, **আল্লাহ পরিস্কার ভাষায় বলেছেন, “আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা কোরো না। তবে আজ কেন আদমকে সেজদা করতে বললেন? হয়তো এর কারণ ফেরেস্তাদের আক্কেল পরীক্ষা করা।** আল্লাহ দেখতে চান যে, ওদের তুচ্ছ করা আদমকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ফেরেস্তারা সেজদা করতে আপত্তি করে কি-না।”

“মনে করুন – কোনো এক ব্যক্তি তার পাচটি ছেলেকে ডেকে জনৈক পথিককে দেখিয়ে বললো, ‘তোমরা সবাই ওকে বাবা বলে ডাকো’। পিতার আদেশ পালন করা কর্তব্য, এ

নীতিবাক্যটি পালন করে চারটি ছেলেই সেই পথিককে ‘বাবা’ বলে ডাকলো। কিন্তু একটি ছেলে ডাকলো না। সে ভাবলো, ‘পিতা কখনো দুজন হতে পারে না। পথিককে বাবা বললে তা হবে মিথ্যে কথা বলা। আর পিতা তো আগেই বলেছেন, কখনো মিথ্যে কথা বলবে না। আমার মুখে পথিককে বাবা ডাকার মধুর শব্দটি শুনে পিতা খুশী হবার জন্য নিশ্চয়ই এ কথাটি বলেননি, বলেছেন আমাদের আক্কেল পরীক্ষার জন্য। সুতরাং পিতার এ আদেশটি না মানাই শ্রেয়।’ এ ভেবে সে ছেলেটি তার জীবনের মহাকর্তব্য (সত্যকথন) পালন করলো, কপট পিতাকে মিথ্যা ‘বাবা’ ডাকলো না। ছেলেদের পিতা তার চার ছেলের অজ্ঞতা দেখে মনোক্ষুন্ন হলেন এবং এক ছেলেকে বিজ্ঞতার পুরস্কার বাবদ তার গলায় দিলেন মেডেল।”

“আল্লাহ হলেন অন্তর্যামী। মানুষ বা ফেরেস্তা কারো বাহ্যিক আচার-আচরণ দেখে তিনি তুষ্ট হন না, বিচার করেন মনের। আদমকে সেজদা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ ফেরেস্তাগণের আক্কেলের পরীক্ষা নিয়েছিলেন। আমি তাতে উত্তীর্ণ হওয়ায় তিনি আমাকে দান করেছেন বিজয়ের একটি নিশানা। কেউ কেউ তাকে বলে আমার পরাজয়ের নিশানা বা লানতের তাওক । বস্তুত আল্লাহ আমাকে দান করেছেন বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ ‘মেডেল’।”

“বলা হয় যে, আমি আদমের শত্রু, আদম জাতির শত্রু; কেন না গন্ধম ভক্ষণ করিয়ে আমি আদমকে বেহেস্তছাড়া করেছি। আসলে তা নয়। যৌনক্রিয়ায় নাকি মানুষ নাপাক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বেহেস্ত হলো চিরপবিত্র স্থান। সেখানে ওসব নাপাকীর কোনো স্থান নেই। কাজেই আদম-হাওয়া বেহেস্তে থাকলে তাদের যৌনক্রিয়া আজীবন বন্ধ রাখতে হতো। ফলে আদম থাকতেন নিঃসন্তান ও নির্বংশ। আদমের প্রেমাসক্তি সম্পূরণ ও বংশবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ আদম-হাওয়াকে স্থান দিয়েছেন পৃথিবীতে তাদের বংশবৃদ্ধির গরজে।”

“বেহেস্তের মধ্যে তখন তিন জাতীয় ফলের গাছ ছিলো। প্রথমত সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ, এর ফলগুলো ছিলো সাধারণ খাদ্য। অর্থাৎ জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য। দ্বিতীয়ত জীবন বৃক্ষ। এর ফলগুলো ছিলো অমরত্বের প্রতীক। অর্থাৎ পরমায়ুবর্ধক। তৃতীয়ত জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ। অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক। এই ‘জ্ঞানদায়ক’ ফলটিরই নামান্তর ‘গন্ধম’।”

“আদমকে যখন বানানো হলো, তখন তিনি ছিলেন নির্জীব মাটির পুতুল এবং আল্লাহ যখন প্রাণদান করলেন, তখন হলেন তিনি সজীব পুতুল। কিন্তু তখনও জ্ঞান বস্তুটি তার মধ্যে ছিলো না মোটেই। এমন কি লজ্জা-জ্ঞানও না। আদম-হাওয়া ছিলেন উলঙ্গ। ইতর প্রাণী ও মানুষের প্রধান পার্থক্য হলো লজ্জাজ্ঞান। আদম-হাওয়ার সেই লজ্জাজ্ঞান জন্মালো গন্ধম ভক্ষণের পর। ক্রমে জন্মালো ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিবিধ জ্ঞান গন্ধম ভক্ষণের ফলে। পক্ষান্তরে বিবি হাওয়া হলেন রজস্বলা গন্ধম ছেড়ার ফলে। কাজেই গন্ধম না খেলে হযরত আদম থাকতেন জ্ঞানশূন্য আর বিবি হাওয়া থাকতেন বন্ধ্যা। আদমের জ্ঞান ও বিবি হাওয়ার সন্তানোৎপাদিক শক্তি জমালো গন্ধম খাওয়ার ফলে। সুতরাং গন্ধম খাইয়ে আমি শুধু আদম-হাওয়ারই নয়, তাবৎ মানবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বংশবিস্তারের সহায়তাই করেছি, যা অন্য কোনো ফেরেস্তা করেননি। কার্যত আমি মানুষের পিতার চেয়ে ভক্তির পাত্র এবং গুরুর চেয়ে মান্যবর। দুঃখের বিষয় এই যে, কতক মানুষ তা বাহ্যত মানতে চান না, তবে কার্যত মেনে চলেন। আর তাতেই আমি সন্তুষ্ট কেননা **একজন বিশ্বাসী মানুষ দিনেরাতে নানা কারণে যতবার আমার নামটি মুখে উচ্চারণ করেন, মনে হয় যে, ততোবার তার বাবার নামও উচ্চারণ করেন না। বিশেষত আমার নামটি তাদের প্রাতঃস্মরণীয় ও অগ্রপাঠ্য**।”

“আপনি ভাবছেন, এ বিরাট পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষকে দাগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় কিরূপে। আপনার এ ভাবনাটা অমূলক নয়। আসলে ও কাজটা ততো কঠিন নয় আমার পক্ষে। কেননা আমি দুনিয়ার সকল অঞ্চলের সকল মানুষকে দাগ দেই না, দাগ দেই ঈমানদাদিগকে। অর্থাৎ যারা আমাকে বিশ্বাস করে তাদেরকে। আমার উপর

যাদের ঈমান নেই, অর্থাৎ আমি আছি বা আমার অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করেন, তারা তো কাফের। কেননা পবিত্র কোরানে আল্লাহ বলেছেন, "শয়তান আছে এবং পবিত্র হাদিছে নবী বলেছেন, ‘শয়তান আছে’। এতদসত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যদি বলে, ‘শয়তান নেই’, তবে পবিত্র কোরান-হাদিছের বাণী অমান্যকারী সে ব্যক্তি কি কাফের নয়?”

“আবার যে ব্যক্তি কাফেরের ঔরসে জন্মলাভ করে, সে তো জন্মসূত্রেই কাফের এবং সে নানাবিধ বেসরা কাজ (মূর্তিপূজা) ইত্যাদি করে থাকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার দাগ দেওয়া ছাড়াই। তাকে তার কৃতকর্মে বাধা দানের অর্থ হয় অসৎকাজে অর্থাৎ পাপকাজে বাধাদান করা। আল্লাহ তো কারো অসৎকাজে আমাকে বাধা দিতে বলেন নি। তাই আল্লাহর আদেশ মেনেই আমি কোনো বিধর্মীকে দাগা দেই না। অর্থাৎ আমার অস্তিত্বের উপর যাদের ঈমান নেই, তাদের আমি দাগ দেই না, এমনকি তাদের কোনো সৎকাজেও না। তাইতো **বর্তমান দুনিয়ায় ঈমানদারদের চেয়ে বেঈমানদারগণই সৎকাজ করেন বেশী**।”

“আমাকে যেমন সকল মানুষকে দাগ দিতে হয় না, তেমন সকল জায়গায় আমি সমভাবে অবস্থানও করি না। **বিশ্বাসীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনা মন্দির ও ধর্মধামেই আমাকে সময় কাটাতে হয় বেশী। কেননা ওগুলোই হচ্ছে আমার প্রধান কর্মকেন্দ্র**। তবে মফস্বলেও কিছু কিছু কাজ না করলে চলে না।”

“আপনার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে যে, অহরহ মানুষের সহবাসে থাকা সত্ত্বেও তারা আমাকে দেখতে বা আমার অস্তিত্বই অনুভব করতে পারে না, এর কারণ কি এবং কোথায় বসে আমি মানুষকে দাগ দিয়ে থাকি? তা বলি শুনুন।”

“আল্লাহ আমাকে ক্ষমতা দান করেছেন মানুষের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতে এবং শিরায় শিরায় চলতে। যখন আমি কোনো ব্যক্তিকে দাগ দিতে চাই, তখন তাকে বাইরে থেকে ডেকে বলি না যে, তুমি এ কাজটি করো না এবং ও কাজটি করো। আমি তখন প্রবেশ

করি তার দেহের কেন্দ্রস্থল মস্তিকে এবং মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিন্দু ত্রিতলা মনের একেবারে নীচের তলায়, যে জায়গাটির নাম 'অচেতন মন' বা 'নিজ্ঞান মন'। সেখানে বসে আমি তার 'অচেতন মন'কে প্রলুব্ধ করি কোনো কাজ করতে বা না করতে। আমার কর্মকেন্দ্র মানুষের মস্তিকের অভ্যন্তরে অবস্থিত। তাই দুষ্ট লোকেরা বলে 'টুপির নীচে শয়তান থাকে'। তাদের সে কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। কেননা আমার অধিষ্ঠানটি টুপির নীচেই উপরে নয়।"

"আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না, কেউ পারে না। আমি যা কিছু করি তদ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাকেই পূরণ করি এবং অন্যেরাও তা-ই করে থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে, বিশ্বাসীরা তা পুরাপুরি মানেন না। তাঁরা আল্লাহকে বলেন সর্বশক্তিমান, আবার কোনো কাজে আমার উপর দোষ চাপান। শুধু তাই নয়, তাঁরা আরও বলেন, **'শুভ কাজের কর্তা আল্লাহতা'লা এবং অশুভ কাজের কর্তা শয়তান।' যদি তা-ই হয়, তবে 'আল্লাহ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও সর্বশক্তিমান' – এ কথাটির সার্থকতা কি?** এতে কি আমাকে 'আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ও দ্বিতীয় শক্তিধর বলে প্রমাণিত হয় না? বস্তুত তা নয়। আমার সমস্ত কাজেই আছে আল্লাহতালার সমর্থন। এখন তাই একটু বলছি।"

"বলা হয়, আল্লাহ দুনিয়ার সব কাজ করবার ক্ষমতাই মানুষকে দান করেছেন। কিন্তু হায়াত, মউত, রেজেক ও দৌলত, এ চারটি কাজ রেখেছেন নিজের হাতে। আবার এ কথাও বলা হয় যে, খুন-খারাবী, চুরি-ডাকাতি ও ব্যভিচারের উদ্যোক্ত শয়তান। তাই যদি হয় অর্থাৎ আমার দাগায় পড়েই যদি কোনো এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে আহত ব্যক্তির জান কবজ করতে আজরাইল ফেরেস্তা সেখানে আসেন কার হুকুমে? সেই দিনটি মৃতব্যক্তির হায়াতের শেষ দিন নয় কি? কলেরা-বসন্তাদি রোগে অসংখ্য মানুষ মরে জীবাণুদের আক্রমনে। সেই জীবাণুদের দাগ দেয় কে?"

"সমস্ত জীবের রেজেক (খাদ্য) দান করেন স্বয়ং আল্লাহতালা। চোর-ডাকাতের রেজেক দান করেন কে? মানুষ জানে না যে, আল্লাহ কার রেজেক কার ভাণ্ডারে রেখেছেন।

আল্লাহ যার রেজেক ও দৌলত যেখানে রেখেছেন, যে কোনও উপায়েই হোক সেখান থেকে এনে সে তা ভোগ করবেই। চোর চুরি করে বটে, কিন্তু আসলে সে তার আল্লাহর বরাদ্দকৃত খাদ্যই খায়। আমি যদি দাগ দিয়ে চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে একের রেজেক অন্যকে খাওয়াতে পারি, তাতে আল্লাহর গৌরব বাড়ে কি? অন্যান্য জীবের রেজেকও আল্লাহতালাই জোগান। গেরস্ত বাড়ির হাঁস-মোরগ ও খাদ্যাদি চুরি করে শেয়াল-কুকুরে খায়। তাদের দাগা দেয় কে?"

"বলা হয় যে, শয়তানের খপ্পরে পড়ে মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাতে আল্লাহর কোনো সমর্থন নেই। যদি তাই হয়, তবে জারজ সন্তানের প্রাণদান করে কে? মানব সৃষ্টোত্তর কালে আল্লাহ যখন মানুষের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই তিনি জানেন যে, কোন প্রাণ কখন কোথায় জমাবে, কে কি কাজ করবে এবং অন্তিমে কে কোথায় যাবে, অর্থাৎ বেহেস্ত না দোজখে। তিনি এ-ও জানতেন যে, কে কার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। তিনি ইচ্ছা করলে ব্যভিচারীদ্বয়কে দাম্পত্যবন্ধন দান করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে জারজ সন্তানদের জন্য প্রাণ সৃষ্টি করে রেখেছেন। জারজ সন্তানদের প্রাণদান করেন আল্লাহ ইচ্ছা করেই। ব্যভিচার ঘটিয়ে আমি আল্লাহর সেই ইচ্ছাকেই পূরণ করি মাত্র।"

"বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, শয়তান না থাকলে মানবজাতির মঙ্গল হতো। তাঁরা ভেবে দেখেননি যে, আমার নির্দেশিত পথে চলেই বর্তমান জগতের মানুষের যতো সব আয়-উন্নতি এবং তারই সাহায্যে চলছে ভালো ধর্মের বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্য। আজ যদি আমি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাই বা আমার দাগাকাজ বন্ধ করি, তাহলে মানবসমাজে যে বিপর্যয় দেখা দেবে তা থেকে রক্ষা পাবে না বিশ্বাসীরাও।"

"প্রথমত কতিপয় রাষ্ট্রীয় দপ্তর থাকবে না। ফলে মন্ত্রিত্ব হারাবে অনেকে এবং রাজ্যশাসনে বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ হবে কর্মহীন। সুরশিল্পী, চিত্রশিল্পী থাকবে না, থাকবে না মাদকদ্রব্যের ব্যবসা। এছাড়া থাকবে না সুদ, ঘুষ, কালোবাজারী ইত্যাদির

পেশা। আর এতে মানবসমাজে যে ভয়াবহ বেকারত্ব ও আর্থিক সংকট দেখা দেবে, তার প্রতিক্রিয়া হবে ধর্মরাজ্যেও। কেননা ঐসব **অসৎবৃত্তির আয় দ্বারাই তো হচ্ছে যতো মসজিদ-মাদ্রাসার ছড়াছড়ি ও হজ্জ্বযাত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি**।"

"কোনো কিছুর অভাব আমার নেই বা অন্য কোনো দুঃখ আমার নেই। একটিমাত্র দুঃখ এই যে, মানুষ আল্লাহকে না জানার ফলে এবং তাঁর কুদরৎ অনুধাবন করতে না পেরে অযথা আমার উপর দোষারোপ করে। আল্লাহ ইচ্ছাময় ও সুমহান।"

"এখন আর বেশী কথা বলার সময় নেই। নামাজের সময় হচ্ছে, মসজিদে যাই। আসসালামু আলাইকুম।"

আগন্তুক চলে গেলেন মসজিদের দিকে। কিন্তু নামাজ পড়তে না দাগ দিতে তা বুঝা গেলো না। মাইকের আজানে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো, চেয়ে দেখি পূর্ব আকাশ পরিষ্কার।

বিস্ময়বিষ্ট হয়ে আমি ভাবতে লাগলাম – এতদিন আমার মনে হচ্ছিলো যে, হিন্দু পুরাণশাস্ত্রে লিখিত 'নারদ মুনি' পরবর্তিকালে 'শয়তান' রূপ লাভ করেছেন। উভয়ের পরিচয়পত্র মিলালে তা বেশ বুঝা যায়। হিন্দুশাস্ত্রমতে – 'নারদ'-এর মাতাপিতা নেই। সে ভগবান ব্রহ্মার মানসসৃষ্টি। তার বাসস্থান ছিলো স্বর্গে এবং সে ছিলো ধার্মিক চূড়ামণি। সে সৃষ্টিকর্তার একটি আদেশ অমান্য করায় অভিশপ্ত হয়ে (মানবরূপে) পতিত হয় মর্ত্যে (পৃথিবীতে)। সে ছিলো সর্ববিদ্যাবিশারদ এবং স্বর্গ-মর্ত্য-অন্তরীক্ষে ছিলো তার অবাধ গতি।[৭]

সৃষ্টি, বাসস্থান, স্বর্গচ্যুতি ও গুণাবলীর বর্ণনায় 'নারদ' এবং 'শয়তান' দুজনের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। শয়তান যেনো নারদের একটি অভিনব সংস্করণ। তবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় নয়, চতুর্থ সংস্করণ। নারদ-নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণের নায়ক

পার্সি ধর্মের 'আহরিমান', তৃতীয় সংস্করণে ইহুদী ধর্মের 'সেদিম' বা 'দেয়াবল' এবং চতুর্থ সংস্করণের নায়ক হচ্ছে শেষ জামানার 'শয়তান'।

পূর্বেকার ঐসব অনুমান আমার হঠাৎ যেনো নস্যাৎ হয়ে গেলো। কেননা মূর্তিমান শয়তান যে আজ আমার চোখের সামনেই বসা ছিলো এতক্ষণ।

৭. সরল বাঙ্গলা অভিধান, সুবলচন্দ্র, পৃ. ৪৫৩

সমাপ্তি

বর্তমানে আমার বয়স প্রায় ৮৩ বছর। কাজেই আজ আমি যে ‘সমাপ্তি নিবন্ধটি লিখছি, তা বাহ্যত এ পুস্তিকাখানার সমাপ্তি হলেও মূলত আমার জীবনেরও সমাপ্তি। তাই আমার জীবননাট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

বরিশাল শহরের অদূরে লামচরি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্ম আমার ৩ পৌষ, ১৩০৭ সালে। চার বছর বয়সে আমার বাবা মারা যান (১৩১১)। অতঃপর বাকি করে জমি ও কর্জ-দেনার দায়ে বসতঘরখানা নিলাম করিয়ে নেন সদাশয় জমিদার ও মহাজনরা ১৩১৭ ও ১৮ সালে। তখন স্বামীহারা, বিত্তহারা ও গৃহহারা হয়ে মা আমাকে নিয়ে ভাসতে থাকেন অকূল দুঃখের সাগরে। সে সময় বেঁচে থাকতে হয়েছে আমাকে দশ দুয়ারের সাহায্যে।

তখন আমাদের গ্রামে কোনোরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো না। শরীয়তী শিক্ষাদানের জন্য এক মুন্সী সাহেব একখানা মক্তব খোলেন তাঁর বাড়িতে ১৩২০ সালে। এতিম ছেলে বলে আমি তাঁর মক্তবে ভর্তি হলাম অবৈতনিকভাবে। সেখানে প্রথম বছর শিক্ষা করলাম স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ তালপাতায় এবং বানান-ফলা কলাপাতায়। কেননা বই-শ্লেট কেনার সঙ্গতি আমার ছিলো না। অতঃপর এক আত্মীয়ের প্রদত্ত রামসুন্দর বসাকের ‘বাল্যশিক্ষা’ নামক বইখানা পড়ার সময় ছাত্রবেতন অনাদায়হেতু মুসী সাহেব তার মক্তবটি বন্ধ করে দিলেন ১৩২১ সালে। আর এখানেই হলো আমার আনুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষার সমাপ্তি বা সমাধি। এরপর কিছুদিন ঘোরাফেরা করে কৃষিকাজ শুরু করি ১৩২৬ সালে।

আমার মা ছিলেন অতিশয় নামাজী-কালামী একজন ধামিকা রমণী। তাঁর নামাজ-রোজা বাদ পড়া তো দূরের কথা, 'কাজা' হতেও দেখিনি কোনোদিন আমার জীবনে। মাঘ মাসের দারুণ শীতের রাতেও তাঁর তাহাজ্জদ নামাজ কখনও বাদ পড়েনি এবং তারই ছোয়াচ লেগেছিলো আমার গায়েও কিছুটা। কিন্তু আমার জীবনের গতিপথ বেঁকে যায় মায়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি দুঃখজনক ঘটনায়।

বিগত ইং ২৭.১০.৭৮ তারিখের 'বিচিত্রা' পত্রিকা, ১০.৬.৮১ তারিখের 'সংবাদ পত্রিকা, ১৯.৭.৮১ তারিখের 'বিপ্লবী বাংলাদেশ' পত্রিকা, ৪.৯.৮১ তারিখের 'বাংলার বাণী' পত্রিকা, ১২.১২.৮২ তারিখের 'সন্ধানী' পত্রিকা ও আমার সম্পাদিত 'স্মরণিকা' পুস্তিকাখানা যারা পাঠ করেছেন এবং যারা ১৭.৪.৮৩ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'প্রচ্ছদ' অনুষ্ঠানে আমার সাক্ষাৎকারের বাণী শ্রবণ করেছেন – তাঁরা হয়তো জানেন আমার দুঃখজনক ঘটনাটি। তবুও সেই অবিস্মরণীয় বিষাদময় ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানে বলছি। সে ঘটনাটি আমাকে করেছে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দ্রোহী।

১৩৩৯ সালে আমার মা মারা গেলে আমি আমার মৃত মায়ের ফটো তুলেছিলাম। আমার মাকে দাফন করার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মুন্সী, মৌলভী ও মুছল্লিরা এসেছিলেন, 'ফটো তোলা হারাম' বলে তারা আমার মা'র নামাজে জানাজা ও দাফন করা ত্যাগ করে লাশ ফেলে চলে যান। অগত্যা কতিপয় অমুছল্লি নিয়ে জানাজা ছাড়াই আমার মা'কে সৃষ্টিকর্তার হাতে সোপর্দ করতে হয় কবরে। ধমীয় দৃষ্টিতে ছবি তোলা দূষণীয় হলেও সে দোষে দোষী স্বয়ং আমিই, আমার মা নন। তথাপি কেন যে আমার মায়ের অবমাননা করা হলো, তা ভেবে না পেয়ে আমি বিমূঢ় হয়ে মার শিয়রে দাড়িয়ে তাঁর বিদেহী আত্মাকে উদ্দেশ্য করে এই বলে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, "মা, আজীবন ছিলে তুমি ধর্মের একনিষ্ঠ সাধিকা। আর আজ সেই ধর্মের নামেই হলে তুমি শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য। সমাজে বিরাজ করছে এখন ধর্মের নামে অসংখ্য অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। তুমি আমায় আশীর্বাদ করো – আমার জীবনের ব্রত হয় যেনো কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস

দূরীকরণ অভিযান। আর সে অভিযান সার্থক করে আমি যেনো তোমার কাছে আসতে পারি।”

“তুমি আশীর্বাদ করো মোরে মা,
আমি যেনো বাজাতে পারি
সে অভিযানের দামামা।”

আমি জানতাম যে, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরীকরণ অভিযানে সৈনিকরূপে লড়াই করবার যোগ্যতা আমার নেই। কেননা আমি একজন পঙ্গু (মূর্খ)। তাই সে অভিযানে অংশ নিতে হবে আমাকে ‘বাজনদার'রূপে। মাতৃশোকের তারুণ্যের উন্মাদনা কিছুটা লাঘব হলে আমি ভাবতে লাগলাম, শোকোমত্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা তো করেছি যে, সে অভিযানে আমি দামামা বাজাবো। কিন্তু তা পাবো কোথায়? দামামা তৈরীর উপকরণ তো আমার আয়ত্তে নেই। তাই কৃষিকাজের ফাকে ফাকে আমাকে আত্মনিয়োগ করতে হলো উপকরণ সংগ্রহের কাজে। অর্থাৎ পড়াশুনার কাজে।

আমার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে দীর্ঘ আঠারো বছর কঠোর সাধনা করে ধর্মীয় কতিপয় অন্ধবিশ্বাসকে দর্শনের উত্তাপে গলিয়ে তা বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢেলে তার একটি তালিকা তৈরী করছিলাম প্রশ্নের আকারে ১৩৫৭ সালে। এ সময় স্থানীয় গোড়া বন্ধুরা আমাকে ‘ধর্মবিরোধী’ ও ‘নাখোদা’ (নাস্তিক) বলে প্রচার করতে থাকে এবং আমার সে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম ছেড়ে শহর পর্যন্ত। **লোক পরম্পরায় আমার নামটি শুনতে পেয়ে তৎকালীন বরিশালের ল-ইয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাবলিগ জামাতের আমীর জনাব এফ, করিম সাহেব সদলে আমার সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন ১৩৫৮ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ তারিখে আমার বাড়িতে এসে, এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বরিশালে গিয়ে তিনি আমাকে এক ফৌজদারী মামলায় সোপর্দ করেন ‘কমুনিষ্ট’ আখ্যা দিয়ে।** সে মামলায় আমার জবানবদি তলব করা হলে পূর্বোক্ত তালিকার প্রশ্নগুলোর কিছু কিছু ব্যাখ্যা লিখে **‘সত্যের**

সন্ধান' নাম দিয়ে তা আমার জবানবন্দিরূপে কোর্টে দাখিল করি তৎকালীন বরিশালের পুলিশ সুপার জনাব মহিউদ্দিন সাহেবের মাধ্যমে, ২৭ আষাঢ় ১৩৫৮ সালে (ইং তাং ১২ ৭ ৫১)।

'সত্যের সন্ধান'-এর পাণ্ডুলিপিখানার বদৌলতে সে মামলায় আমি দৈহিক নিকৃতি পেলাম বটে, কিন্তু মানসিক শান্তি ভোগ করতে হলো বহু বছর। কেননা তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, 'সত্যের সন্ধান' বইখানা আমি প্রকাশ করতে পারবো না ও ধর্মীয় সনাতন মতবাদের সমালোচনামূলক অন্য কোনো বই লিখতে পারবো না এবং পারবো না কোনো সভা-সমিতিতে-বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বমত প্রচার করতে। যদি এর একটি কাজও করি, তবে যে কোনো অজুহাতে আমাকে পুনঃ ফৌজদারীতে সোপর্দ করা হবে। অগত্যা কলমকালাম বন্ধ করে আমাকে বসে থাকতে হলো ঘরে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত। এভাবে নষ্ট হয়ে গেলো আমার কর্মজীবনের অমূল্য ২০টি বছর।

বাংলাদেশে কুখ্যাত পাকিস্তান সরকারের সমাধি হলে পর 'সত্যের সন্ধান' বইখানা প্রকাশ করা হয় ১৩৮০ সালে, রচনার ২২ বছর পর। এর পরে লিখিত আমার পুস্তক হচ্ছে — সৃষ্টি-রহস্য, মুক্তমন, স্মরণিকা ও অনুমান। আমার প্রণীত বা সম্পাদিত আলোচ্য যাবতীয় পুস্তক-পুস্তিকাই হচ্ছে আমার মায়ের মৃত্যুদিনের বাঞ্ছিত 'দামামা'র অংশবিশেষ। এছাড়া আমার অন্যান্য কৃতকর্মেও রয়েছে ঐ একই প্রেরণা। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে **'মানবকল্যাণ'**।

১৩৫৮ সালে **'সত্যের সন্ধান'**-এ আমার যে বাজনা শুরু হয়েছিলো, ১৩৯০ সালে **'অনুমান'**-এ তার সন্ধ্যা-বিরতি, হয়তোবা সমাপ্তি।

কিন্তু –

এসে জীবনের সন্ধ্যাবেলা,
দেখি এ জেহাদ নয়, খেলা।
যদি আবহাওয়া থাকে ভালো,
তবে নিশীথেও চলবে খেলা,
থাকবে যতোক্ষণ আলো।
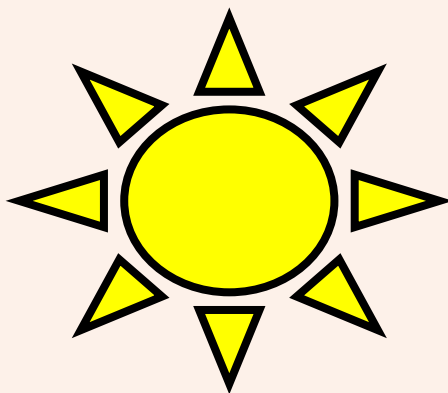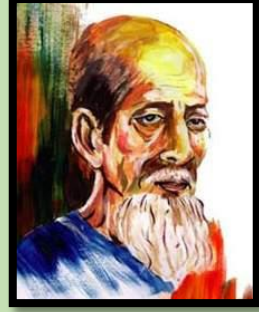
আরজ আলী মাতুব্বর

(১৭ ডিসেম্বর, ১৯০০ – ১৫ মার্চ, ১৯৮৫)

আরজ আলী মাতুব্বর একজন বাংলাদেশী দার্শনিক, মানবতাবাদী, চিন্তাবিদ এবং লেখক। নিজ চেষ্টা ও সাধনায় বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম ও দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞান অর্জন করেন। ধর্ম, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নানামুখী জিজ্ঞাসা উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। ৮৫ বছর জীবনকালের বেশিরভাগ সময়ই লাইব্রেরিতে কাটিয়েছেন পড়াশোনা করে। জ্ঞান বিতরণের জন্য তিনি তাঁর অর্জিত সম্পদ দিয়ে গড়ে তুলেছেন **'আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরি'**। তিনি বাংলা একাডেমীর আজীবন সদস্যপদ (১৯৮৫), বাংলাদেশ লেখক শিবিরের 'হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৭৮) ও বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর (বরিশাল শাখা) সম্মাননা (১৯৮২) লাভ করেন।

তিনি ১৯৮৫ সালের ১৫ মার্চ বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

একটি ধর্মকারী ইবুক

dhormockery@gmail.com
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
www.kufrikitab.blogspot.com